জীবন জাগার গল্প—১৩
ওগো, শুনছো!
মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

উৎসর্গ

মুফতী আবদুল কাহহার (বগুড়া)

বড় বড় কথা অনেকেই বলে। কাজ করে দেখাতে পারার হিম্মত হয় ক'জনের? বুক চিতিয়ে নিজের হালাল ইচ্ছা ও প্রয়োজনকে বাস্তবায়িত করার মতো বুকের পাটাই-বা থাকে ক'জনের? তিনি একজন সাহসী পুরুষ! ভণিতাহীন মানুষ! অকপট আলিম! আপাতত 'মাসনা'-তে আছেন। চেষ্টা করছেন পক্ষপাত (عَوْل)-হীন ইনসাফ (عَدْل) কায়েম রাখতে। মোবাইলে আলাদা একটা মেমো-ফাইলই খুলেছেন, পালাবণ্টন ও দুই সংসারে খরচের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে। রাব্বে কারীম তার এ প্রয়াসকে 'রুবাআ'-তে পৌছে দিন! তার আগত-অনাগত আহল ও আয়ালকে নূর-বরকত-তাকওয়ায় ভরপুর করে দিন।

শুরুর কথা

মানুষ ঘরে ফেরার তাকিদ অনুভব করে কেন? পাখি কেন সন্ধ্যায় নীড়ে ফেরে? গরু কেন সুয্যি ডুবলে গোয়ালে চলে আসে? মোরগ কেন আঁধার নেমে এলে খোঁয়াড়ে এসে আশ্রয় নেয়?

মানুষের ঘরে ফেরা আর পশু-পাখির ঘরে ফেরার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? মনে হয় আছে। মানুষের ফেরার পেছনে মায়া-মমতা, ভালোবাসা-মহব্বত কাজ করে। পশুপাখির ফেরার পেছনে এসব কিছু কাজ করে না। তারা ফেরে নিছক আশ্রয়ের জন্যে। অভ্যাসের বশে।

পক্ষান্তরে মানুষ জানে, ঘরে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, আম্মু, আব্বু, ভাইবোন, ছেলে-মেয়ে! জীবনসঙ্গিনী! অথবা অন্য কেউ। এখানেই মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য! মানুষের জন্যে কেউ না কেউ অপেক্ষা করে থাকে। যন্ত্রের জন্যে কেউ অপেক্ষা করে না।

ব্যতিক্রমও আছে। ঘরে মানুষ আছে। কিন্তু তার জন্যে কেউ প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে না, এমনও হয়। কেউ একজন তার জন্যে ভাত বেড়ে বসে থাকছে না। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দূরের পানে চেয়ে থাকছে না। বারবার মোবাইল করে 'আর কদ্দূর'? বলে অস্থিরতা প্রকাশ করছে না। অথচ ঘরে মানুষের অভাব নেই। জীবনসঙ্গিনী থেকে শুরু করে সবাই আছে! একটা সংসার এমন প্রাণহীন কীভাবে হয়ে পড়ে?

একটা জীবন্ত প্রাণবন্ত সংসারের মূল চাবিকাঠি কী? কথা বলা। দুজনের কথা বন্ধ হয়ে গেলেই চিত্তির! আস্তে আস্তে প্রাণরস ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে থাকে। অভাব-অভিযোগ দানা বাঁধতে থাকে। শুধু কথা বললেই হবে না, বলাটা হতে হবে আন্তরিক সুরে! কথা চালাচালির ঝগড়াটে প্রতিবাদী ভঙ্গিতে নয়।

আবার কথা বললেই সম্পর্ক টিকে থাকবে, দাম্পত্যের মাধুর্য চুইয়ে চুইয়ে পড়বে, এমনটা ভাবাও শতভাগ ঠিক নয়। অনেক দম্পতি আছেন, তারা সারাদিনে একটা কথাও বলেন কি না সন্দেহ! কিন্তু দুজনের কী গভীর টান! আসলে তাদের দুজনের কথা হয় না, একথা বলা ঠিক নয়। তাদের কথা হয়। সেটা মুখের কথা নয়, হৃদয়ের কথা। অনুভবের কথা। চোখের দেখাদেখির কথা।

কত বুড়োবুড়িকে দেখেছি, সারা সন্ধ্যা চুপচাপ বসে আছেন। সামান্য ঠোঁটটুকুও নড়েনি। একে অপরের দিকে তাকানওনি। তবুও তাদের দুজনের মধ্যে অদৃশ্য এক নির্ভরতা কাজ করে। অচ্ছেদ্য এক বাঁধন দুজনকে ধরে রাখে। একজন মারা গেলে দেখা যায় আরেকজনও ক'দিন পর মারা গেছেন। বিচ্ছেদ জ্বালা সইতে পারেননি।

কী এমন গোপন বাঁধন ছিল, আরেকজনকে মরে যেতে হলো? হায়াত-মউত আল্লাহর হাতে! হায়াত শেষ হয়েছে, মারা গেছে। তবুও কিছু প্রশ্ন-খটকা থেকেই যায়! অসুখ-বিসুখে মানুষ মারা যায় না! মানুষ বাহ্যিক একটা কারণ খুঁজতে অভ্যস্ত! এ ক্ষেত্রেও মনে করা হয়, একাকিত্ব তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাকে ছাড়া দুনিয়া নিঃসীম শূন্যতায় ভরে গিয়েছিল। বেঁচে থাকাটা পানসে হয়ে গিয়েছিল। এদিকে হায়াতও ফুরিয়ে গিয়েছিল। একটা মূল কারণ, আরেকটা বাহ্যিক কারণ!

পুরুষের জীবনে নারীর উপস্থিতি প্রয়োজন, নারীর জীবনেও পুরুষের উপস্থিতি প্রয়োজন। প্রয়োজনের মাত্রাটা কার বেশি? চট করে বলে দেয়া সম্ভব নয়। নারীর জীবনে স্বামীর উপস্থিতি নারীর কতটা প্রয়োজন তা একজনের অভিব্যক্তিতে সেটা কিছুটা ফুটে উঠেছে :

-স্বামী ছাড়া শ্বশুরবাড়িতে মন টিকতে চায় না। স্বামী মারা গেলে, নিজের ঘরেও মন মানে না। ছেলে যতই আপন হোক, কোথাও যেন একটা দূরত্ব থেকেই যায়। স্বামী মারলেও পরে কাছে টেনে নেয়! আমার প্রয়োজন স্বামী যতটা বুঝবেন, ছেলে এতটা বুঝবে না। আর অল্প বয়েসে স্বামী মারা গেলে আর কথাই নেই! সবার করুণার পাত্র হয়ে জীবন পার করতে হয়। সংসারের সব কাজ করতে হয়ই, উল্টো খোঁটাও শুনতে হয় উঠতে-বসতে! সবার মনোভাব এমন যেন, দয়া করে দু-মুঠো খেতে দিয়েছে! আমারও যে এ বাড়িতে হক আছে, সেটা কারও মনে থাকে না! অনেক পরিবারেই স্বামীহারা মেয়েকে অঘোষিত চাকরানি মনে করা হয়।

দুজন দুজনার-এর কাজ শেষ করার পর ভেবেছিলাম, এই শেষ। এ বিষয়ে আর কোনো গল্প পাব না। এখন দেখি, দ্বিতীয় খণ্ড শেষ করার পর তৃতীয় খণ্ডও অনেক দূর হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ! রাব্বে কারীম সবার মেহনত কবুল করুন।

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জীবন জাগার গল্প : ৬৭৩

দুই এতিমের সংসার!

অনেক দিন পর তিনজন একসাথ হলাম। প্রায় বারো বছর পর। আলাদাভাবে দুজন একসাথ হলেও, কিন্তু 'তিন টেক্কা' একসাথ হয়ে সময় কাটানোর সুযোগ হয়ে ওঠেনি। দুজন প্রবাসী, আরেকজন সারাক্ষণ ব্যস্ত। সুযোগ হবে কী করে? ব্যাটে-বলে এক হচ্ছিল না। জীবন আসলে এমনই। যখন এক প্লেটে সাত-আটজন একসাথে খাবার খেতাম, তখন মনে হতো, এ বাঁধন বুঝি কখনো টুটে যাওয়ার নয়। কিন্তু দাওরার পর দু-দিনের মাথায়ই পরিষ্কার হয়ে গেল, জীবন কারও জন্যে থেমে থাকে না। সবার পথচলাও এক নিয়মে হয় না। হওয়া সম্ভব নয়।

* * *

রমযানের শুরু থেকেই পরিকল্পনা চলছিল। একদিন যেভাবেই হোক, সময় বের করতে হবে। ইফতারির মজলিসে বসতে হবে। সময় পেছাতে পেছাতে শেষমেশ বসা হলো। এতদিন একজনের সময় হলে আরেকজন ব্যস্ত। আরেকজন আবার নবপরিণত! নট নড়নচড়ন। একটু ঘর থেকে বের হলেই মান-অভিমানের পালা শুরু হয়ে যায়। 'যেয়ো না সাথি' (لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا) লা তাযানী ফারদান। আমাকে একাকী রেখে যেয়ো না! কিন্তু ব্যাটা ছেলের মন কি সারাক্ষণ ঘরে আটকে থাকতে চায়? নতুন অভিজ্ঞতা লেনদেনের জন্যে হলেও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ছুটে আসতে হয়। অবশ্য বন্ধুদের সাথেও বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। একটু পরে মনটা ভীষণ আকুপাকু করতে থাকে! কানে শুধু চুড়ির রিনিঝিনি ঝংকার অনুরণিত হতে থাকে! চোখে লেগে থাকে মেহেদিরাঙা হাত! টোপর পরা এক 'মুখচ্ছবি'!

* * *

যাক, শেষ পর্যন্ত জামাই বাবাজি কোনোমতে পালিয়ে এল! এরচেয়ে না এলেই ভালো করত! বিয়ের পর যা হয় আরকি! তেনারা কেন যেন স্বামীর বন্ধুদের একদম সহ্যই করতে পারেন না। ভালোবাসা নিজের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী মেনে নিতে পারে না। সারাক্ষণ আঁচলের নিচে বেঁধে রাখতে পারলেই বাঁচে। এক মধুর ঝামেলা! নতুন জামাই ফাঁকি দিয়ে, 'তাকে' ঘুমে রেখে, পেছনের দরজা দিয়ে একপ্রকার পালিয়েই চলে এসেছে।

এসেও কি দু-দণ্ড নিস্তার আছে? ফোনাঘাতের পর ফোনাঘাত! আমরা বাকি দুজন তাদের প্রণয়াঘাতে অতিষ্ঠ! আরে বাপু, রমযান মাসে দিনে তো রোযা! নাও ম্যাও সামলাও!

* * *

আমিও বহুদিন পর, হুযুরের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে 'স্কুল' থেকে পালালাম। যোহরের পর থেকে শুরু হলো গল্প ও স্মৃতি রোমন্থনের অভিযাত্রা। লেখাপড়ার কথা, সংসার জীবনের কথা, বিদেশযাপনের কথা, আমল-আখলাকের কথা, আশার কথা, স্বপ্নের কথা, সফলতার কথা, ব্যর্থতার কথা চলল। পাশাপাশি নতুন জামাইকে পুরোনো 'অভিজ্ঞ' দুই জামাইয়ের বিভিন্ন টিপস-ট্রিকস প্রদানও চলছিল। এভাবে আসর পর্যন্ত চলল। শুয়ে-শুয়ে, বসে-বসে। আধশোয়া হয়ে। কাত হয়ে। চিত হয়ে। উপুড় হওয়াটাই ছিল বাকি। সাইফুল সেটাও বাকি রাখল না। তার কোমরে ব্যথা! আশপাশ থেকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে, নানা ভঙ্গির, হরেক-রকমের নাক ডাকার আওয়াজ-স্বর-সুর ভেসে আসছিল। বাজখাঁই-হুংকার-হ্রেষা-হাম্বা-ম্যাঁএএ-মিঁয়াও হয়ে। পুরো মসজিদ থেকে যেন আষাঢ়ের খাল-বিল-ডোবার আওয়াজ আসতে লাগল। একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার হলো, রমযানে যোহরের পর, মসজিদে শুয়ে থাকার মতো আরাম আর কিছুতে নেই। সেজন্যেই কি না জানি না, পুরো মসজিদজুড়েই ইতিউতি মানুষ শুয়ে আছে। নাকও ডাকাচ্ছে কেউ কেউ। শরীয়তের মাসআলা কী বলে কে জানে! তবে উমর রা. মসজিদে শুয়ে শুয়ে এভাবে বিকটস্বরে কাউকে নাক ডেকে ঘুমুতে দেখলে, নির্ঘাত লাঠি হাতে তাকে মসজিদ ছাড়া করতেন!

* * *

আসর পড়ে শুরু হলো পুরো ফেনী বাজার চষে সেরা সেরা ইফতারির আইটেম কেনা। চিন্তা কী, টাকা দেবে গৌরি সেন! আজ তিনজনের যৌথ আয়োজন হলেও, মূল উদ্যোক্তা সাইফুল! সে এমনিতেই দরাজদিল মানুষ! তায় আবার রমযানের 'বাড়ি'! পকেটে কুলোলেও পেটে ও হাতে কুলোবে না বলে, আরও বেশ কিছু 'পদ' অধরা থেকে গেল। অবশ্য পুরোপুরি অধরা রইল না! চোখ দিয়ে আচ্ছমতো চাখা হলো! শুধু কি গন্ধেই অর্ধভোজন? চোখ দিয়ে চেখেও কিন্তু ভোজনের রস আস্বাদন করা যায়!

* * *

গরু-মোরগ মুসল্লাম-খাসি কিছুই বাদ পড়ল না। ফল-পাকড়ও কেনা হলো এন্তার!। ছয় হাত ভর্তি করে ফাঁপরে পড়া গেল, এবার কোথায় যাই?

যাওয়ার জায়গার তো অভাব নেই! কিন্তু প্রাইভেসি? ঠিক হলো পার্কে বসা হবে। খোলা নীল আকাশের নিচে। দিঘির পাড়ে। বিশাল সরোবর। স্বচ্ছতোয়া টলটলে পানি! আমরা বসলাম উত্তর পাড়ে। দক্ষিণে বিপুল জলরাশি! দখিনা বাতাস ক্লান্তিহীন বয়ে বেড়াচ্ছে। সারাদিনের রোযার ক্লান্তি নিমিষেই উবে হাওয়া! কর্পূর! এখানে একচিলতে পার্ক আছে। পরিবেশটা নির্ঝঞ্ঝাট নয়। অনিন্দ্যও নয়।

* * *

কিন্তু সত্যিকারে রোযা শুরু হলো তখন। শরীর জুড়িয়ে গেল দখিনা সমীরণে। কিন্তু সামনে এতসব মজার পেট ও মুখরোচক খাবার থাকলে জিবে জল-পানি-ওয়াটার-মা-এর স্রোত নামবে না তো কী?। কোথায় দিঘির জলে কার ছায়া গো-এর শোভা দেখব, তা না চোখ শুধু ঘুরে-ফিরে খাবারের দিকেই চলে যাচ্ছে। এখানে বসে নজরের হেফাজত নিয়েও বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। আমরা তিনজন নিজেদের নিয়েই মজে আছি। সময় ফুরিয়ে গেলেও কথা ফুরোয় না।

* * *

অনেক খুঁজে পেতে জুতসই একটা আসন পাওয়া গেল। ঠিক মাঝ বরাবর। পুরো দিঘিটা একনজরে দেখা যায়। আশেপাশে কী হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকেও চোখ রাখা সহজ। রোযার দিন হওয়াতে তেমন মানুষজন নেই। ফাঁকা। খাঁ খাঁ। একদম যে নেই, তাও নয়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু কপোত-কপোতীর আনাগোনা বিরল নয়। তারা তাদের কাজে মশগুল থাকুক। আমরা আমাদের শুগলে থাকি। ইফতার বানানো চলছে, সাথে সাথে মুখও চলছে। না না, খাওয়া নয়; কথা।
এতক্ষণ চলছিল সবকিছু ঠিকঠাক! আমাদের অদূরেই বসা ছিল এক যুগল। খাঁটি হুযুর-হুযুরনী! এক কোণে নিরালায় একান্তে বসে ছিল। নিবিড় হয়ে। তবে দৃষ্টিকটুভাবে নয়। এক দেখাতেই বলে দেয়া যায়, তাদের দুজনের পার্কে বসে থাকার মাঝে পাপের কিছু নেই। শান্ত-স্নিগ্ধ কিছু একটা লেপ্টে আছে। আমরা পার্কে প্রবেশের পর থেকেই দেখছিলাম, দুজনের মধ্যে চাপা একটা অস্বস্তি কাজ করছিল। হুযুর বার বার আড়চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। ব্যাপারটা প্রথমে চোখে পড়েনি। সাইফুলের জহুরি-চোখেই ব্যাপারটা ধরা পড়ল। একটু পরে আমাদের অবাক করে দিয়ে, তারা দুজন অন্যদিকে চলে গেল। আরেক পাশে গিয়ে বসল। আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে। একটা বড়সড় বেলি ফুলগাছের নিবিড় আড়ালে।

* * *

ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু ঠেকল। সন্দেহজনক। তারা তো আমাদের অবস্থান থেকে বেশ দূরেই ছিল। একটা গাছের ওপাশে। তাদের কথাবার্তা আমাদের শোনার কথা নয়। এমনকি সরাসরি দেখাও যাচ্ছিল না। যাক আমরা গাল-গপ্পে ডুবে গেলাম। বিষয়টা নিয়ে ভাবার সময় পেলাম না। নিজেদের নিয়েই ভাবনা শেষ হচ্ছে না, সেখানে কোথাকার কে না কে!

* * *

ইফতারির তখনো বেশ দেরি। আমরা সাইফুলের আইফোনের বিভিন্ন তেলেসমাতি দেখা নিয়ে ব্যস্ত। সেই হুজুর-যুগলের পুরুষজন এলেন। কোন ফাঁকে এলেন, টেরটিও পেলাম না। আমাদের একদম পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালেন। আমরা আচানক একজনকে পাশে দাঁড়াতে দেখে চমকে উঠে মুখ তুলে তাকালাম। কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে তিনি বললেন :

-ভাই, একটু হাম্মামের প্রয়োজন ছিল। কোথায় পাওয়া যায়? পার্কেরটা তো বন্ধ। তালা দেয়া।

এবার তিনজন একযোগে চোখ তুলে তাকালাম। চেহারা দেখেই বোঝা গেল, খুবই গরিব ঘরের মানুষ। শাদা জুব্বা-পায়জামা। কাঁধে খাঁটি হুযুরদের মতো জীর্ণ একটা লাল রুমাল ঝোলানো। চাপ দাড়ি। গায়ের রঙ কালোর দিকে। চোখে দুটোতে কেমন একটা অসহায়-নিরীহ দৃষ্টি। কথা বলার সময় ঠোঁটের কোণে কেমন একটা বিষণ্ন হাসি লেপ্টে আছে। দাঁতের পাটি খুবই বিন্যস্ত। অসম্ভব শাদা। মানুষটার সকরুণ হাসি দেখেই আমাদের তিনজনের মনটা কেমন হয়ে গেল। চেনা নেই জানা নেই তবুও আমাদের মতোই একজন হুজুর!

* * *

সাইফুল মানুষটার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসল। আসলে তাদের এমন বেমক্কা উঠে যাওয়াটা আমাদের মনে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

-আপনারা আমাদের দেখে চলে গেলেন কেন?

-না না, ভাই অন্য কিছু মনে করবেন না। ও আমার স্ত্রী।

-বাথরুম কি আপনার জন্যে?

-জি না। ওর জন্যে।

* * *

সাইফুল সব কাজের কাজী। এক দৌড়ে গিয়ে পার্কের অফিসে হম্বিতম্বি করে বাথরুমের চাবি নিয়ে এল। হুযুরও দৌড়ে গিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে এলেন। আমাদের অবস্থান থেকে একটু দূরেই বাথরুম। অত্যন্ত পুরোনো দীর্ণ একটা বোরখা। হাত-মোজা পা-মোজা পরা। জুতোগুলো ছেঁড়া। না চাইতেই বিষয়গুলো নজরে পড়ে গেল। স্বামীর জুতোগুলোও দেখলাম ছেঁড়া! পা ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে হাঁটছেন। কিন্তু কী অসম্ভব মমতায় স্ত্রীর ধরে হাম্মামে নিয়ে যাচ্ছেন। যেন পাখির ছানা, বাসায় বনবেড়াল হানা দিয়েছে। বুক দিয়ে আগলে রাখছে।

* * *

সাইফুল হুযুরকে ডেকে বলল,
-আমাদের সাথে ইফতারি করবেন?
-জি না ভাই, লাগবে না। ও সাথে করে নিয়ে এসেছে।
কথা আর এগুলো না, স্ত্রী প্রয়োজন সেরে বের হলো। আমরা বলে দিলাম:
-সম্ভব হলে, তাকে রেখে একটু আসবেন।

* * *

আমরা ভেবেছিলাম হুযুর আসবেন না। আমাদের অবাক করে দিয়ে একটু পরেই চলে এলেন।
-আপনারা এ সময় পার্কে কেন? বাসায় যাবেন না?
প্রশ্নটা শুনে হুযুর একটু থমকে গেলেন। চুপচাপ থেকে যা বললেন, তা শোনার জন্যে আমরা তিনজনের কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। আমাদের মনের মধ্যে, স্নেহ-করুণা-ভালোবাসা-শ্রদ্ধার এক অবিমিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি হলো। হুযুর বললেন,
-বাসা থাকলে তবে তো যাব! এই মুহূর্তে আমাদের আসলে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। তাই পার্কই ভরসা। কোনো হোটেলে যেতে পারতাম, কিন্তু সেখানে নিরাপদ নয়। লোকজন ভিন্নরকম সন্দেহ করে। আর ওখানে যেতে টাকাও লাগে! আপতত সেটা সম্ভব নয়!
-মানে?
-আমাদের দুজনেরই আসলে কোনো বাড়িঘর নেই।
-বলছেন কী! এটা কী করে সম্ভব? খুলে বলুন তো!
হুযুর প্রশ্নটা শুনে একটু যেন বিমনা হয়ে গেলেন। চেহারায় সংকোচ ফুটে উঠল। শরম-দ্বিধা-জড়তার মিশেলে অন্যরকম একটা অভিব্যক্তি। তার সে

সময়কার মুখাবয়ব দেখে, বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল। হাহাকার শুরু হলো সেখানে। মানুষটাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের উত্তর দিতে ভীষণ লজ্জা পাচ্ছেন।

-আচ্ছা, সমস্যা থাকলে বলার দরকার নেই। আসুন অন্য কথা বলি।

-না না, বলছি। কথা তো অনেক লম্বা। দু-এক কথায় আসলে সব বলা যাবে না।

-আপনি খুলেই বলুন। আমরা শুনব।

আমার বাবা ছিলেন গ্রামের মসজিদের মুয়াজ্জিন। খুবই গরিব। আত্মীয় স্বজন থেকেও নেই। জমিজমা বলতে ছোট্ট একটা ভিটে। সেটাও পৈতৃকসূত্রে পাওয়া নয়। আব্বা মসজিদে চাকরি নিয়ে এলেন। অনেক দিনের চাকরির সুবাদে, গ্রামের মানুষ ধরাধরি করে, সেখানেরই এক এতিম মেয়ের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন।

মেয়েরা বিয়ের পর স্বামীর বাড়ি গিয়ে ওঠে। আব্বাজান বিয়ে করে বউয়ের বাড়ি গিয়ে উঠলেন। দাদাজান আব্বাকে কিছুই দিয়ে যেতে পারেননি। এমনকি ভিটেমাটিটুকুও না। বড় কষ্ট করে বড় হয়েছেন আব্বু!

* * *

আমার আম্মা থাকতেন তার মায়ের সাথে। খুবই কষ্টে। এ বাড়ি-ও বাড়ি ঝিয়ের কাজ করতেন আমার নানি। কিন্তু মেয়েকে এসবে জড়াতে দেননি। টাকা-পয়সার অভাবে লেখাপড়াও শেখাতে পারেননি। কিন্তু আমার নানি খুব সুন্দর কুরআন শরীফ পড়তে পারতেন। সেটাই মেয়েকে শিক্ষা দিয়েছেন। যত্ন করে। আমার মায়ের শিক্ষা বলতে এটুকুই।

* * *

আমার মায়ের বিয়ের কিছুদিন পর নানি মারা গেলেন। আব্বাজান মসজিদ থেকে যা পেতেন, ওটা দিয়েই কোনোরকমে সংসার চলছিল। আমার বয়েস তখন আট। আম্মাজান ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কোনো চিকিৎসাতেই কিছু হচ্ছিল না। এদিকে টাকা-পয়সার টানাটানি। আব্বাজান কারও কোনো বারণ না শুনেই আমাদের একমাত্র সম্বল বাড়ির ভিটেটা বন্ধক দিয়ে টাকা আনলেন। আম্মাজানকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করালেন। এক সপ্তাহ পর আম্মাজান জান্নাতবাসী হলেন। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হায়াত যার নেই, তাকে বাঁচাবে কী করে?

* * *

আব্বাজান শোকে পাগলের মতো হয়ে গেলেন। শুধু সময়মতো আজানটুকু দেন। সারাক্ষণ মনমরা হয়ে মসজিদে বসে থাকেন। আম্মুর কবরের সামনে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। এরই মধ্যে আমি পাশের গ্রামে নূরানী শেষ করে হেফযখানায় ভর্তি হয়েছি। আমার হেফয শেষ হওয়ার আগেই, বন্ধকের টাকা শোধ করতে না পারায় আমার মায়ের শেষ স্মৃতি, বাড়ির ভিটেটা হাতছাড়া হয়ে গেল।

* * *

আব্বাজান স্থায়ীভাবে আগের মতো মসজিদে আশ্রয় নিলেন। আমিও মাদরাসার ছুটিছাটায়, আব্বাজানের কাছে মসজিদেই উঠতাম। মসজিদই ছিল আমার বাড়ি-ঘর। মুসল্লিদের বাড়ি থেকে আব্বাজানের জন্যে যে খাবার আসত, সেটাই বাপ-বেটা ভাগাভাগি করে খেতাম। আব্বাজান আমাকে মায়ের স্নেহে মানুষ করার চেষ্টায় কোনো কসুর করতেন না।

* * *

খাবারের কষ্টের কারণে পরের দিকে আমি ছুটি হলেও মাদরাসাতেই থেকে যেতাম। আব্বার কাছে বাড়তি টাকা থাকত না। বাড়ি-বন্ধকের টাকা ছাড়া আরও কিছু ঋণ হয়ে গিয়েছিল, বেতনের টাকা পেয়েই কিছু কিছু শোধ করতেন। ক'টাকাই-বা পেতেন! ওষুধ-বড়ি কিনে খাওয়ার মতো টাকাও তার হাতে থাকত না। দুশ্চিন্তা আর শোকে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করতে পারতেন না। মুখের রুচি চলে গিয়েছিল। হজমের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। অনিয়মের কারণে শরীরে নানা রোগ বাসা বেঁধেছিল।

* * *

মায়ের শোক আব্বাজান বেশিদিন সইতে পারলেন না। আমার খতম হওয়ার বছর ইন্তেকাল করলেন। ছেলেকে হাফেয দেখার কী অসম্ভব আরজু ছিল! পূরণ হলো না। আমি পুরোপুরি এতিম হয়ে পড়লাম। ইহজনমে আমাকে দেখার মতো কেউ রইল না। আব্বাজান ছিলেন আমার সমস্ত আশা-ভরসার স্থল। তিনি চলে যাওয়ায়, চারদিকটা ফাঁকা হয়ে গেল। মাদরাসার বার্ষিক মাহফিলে যখন আমাকে পাগড়ি পরানো হচ্ছিল, আব্বাজানের আজন্ম ইচ্ছার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আমাদের বড় হুযুর যখন পাগড়ি পরিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। আমি হাউমাউ করে কেঁদে ফেললাম। উপস্থিত হাজার-হাজার মানুষের অনেকেই আমার কথা জানত। তাদের অনেকেও কেঁদে ফেলল। এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হলো। বড় হুযুর আমাকে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন।

আব্বাজান মারা যাওয়ার পর তিনিই আমাকে আগলে রাখতেন। সন্তানের মতো আদর করতেন। কাছে ডেকে কথা বলতেন। গল্প করতেন । প্রায় বৃহস্পতিবারে সাইকেলের পেছনে চড়িয়ে তার বাড়িতে নিয়ে যেতেন।

* * *

হেফযখানা থেকে ফারেগ হলাম। সে মাদরাসাতেই কাফিয়া জামাত পর্যন্ত পড়লাম। এরপর আর জামাত নেই। হুযুর পরামর্শ দিলেন, হাটহাজারী চলে যেতে। ভাড়া ও কিছু খরচাপাতি সাথে দিলেন।

* * *

ভাই, কাহিনি অনেক লম্বা! হাটহাজারী যাওয়ার কিছুদিন পর টাকা ফুরিয়ে গেল। এক ভাইয়ের পরামর্শে অন্যদের খাবার রান্না করে দেয়ার চাকরি নিলাম। বিনিময়ে কিছু টাকা পাওয়া যেত, খাবারটাও ফ্রি। রিকশা চালিয়েছি। খেতে কাজও করেছি। ইচ্ছে ছিল, দেওবন্দ যাব। আব্বাজান কার কাছে শুনেছিলেন দেওবন্দের কথা। কয়েক বার বলেছিলেন। তখন ছোট ছিলাম, বুঝতে পারিনি। হাটহাজারী এসে বুঝতে পেরেছিলাম। তাই টাকা জমাচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত দেওবন্দ যাওয়া হলো না। দাওরা পাশ করলাম।

* * *

হাটহাজারীর দীর্ঘ ছাত্রজীবনে কোথাও যাইনি। যাওয়ার জায়গাও ছিল না। যাব কোথায়? একবার খুব খারাপ লাগায়, চুপিচুপি আমাদের ভিটেটা দেখে এসেছিলাম। আম্মাজান-আব্বাজানের কবর জিয়ারত করে এসেছিলাম। ছেলেবেলার চিরপরিচিত গ্রামটা কেমন খাঁ খাঁ করছিল।

* * *

আমার আগের মাদরাসার বড় হুযুরের সাথে একটু যোগাযোগ ছিল। তিনিই পরামর্শ দিলেন, গ্রামের মাদরাসায় গিয়ে শিক্ষকতা শুরু করতে। তাঁর পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারলাম না। ছেলেবেলার মাদরাসায় এসে যোগ দিলাম। সুযোগ পেলেই পাশের গ্রামে চলে যেতাম। একজন গৃহহীন-ছন্নছাড়া মানুষ আমি। আম্মাজান-আব্বাজানের স্মৃতিটুকুই আমার সম্বল। আমার এত অসহায়ত্ব সত্ত্বেও আল্লাহ আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছেন। এর শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। আমার মাওলানা হওয়া তো দূরের কথা, হাফেয হওয়ারও কথা ছিল না। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম,

-আল্লাহ আমাকে অযোগ্যতা সত্ত্বেও এত নেয়ামত দিয়েছেন। এতদূর নিয়ে এসেছেন, এর শুকরিয়া আমি একটু অন্যভাবে আদায় করার চেষ্টা করব।
-কীভাবে?
-দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি বিয়ে করব এমন মেয়েকে যে আমার চেয়েও অসহায়।

* * *

হাটহাজারী পড়াবস্থায় এক ছাত্রের সাথে কিছুটা সখ্য হয়েছিল। ফারেগ হওয়ার পরও তার সাথে যোগাযোগ হতো। শহরে তাদের বড় কাপড়ের দোকান ছিল। মাদরাসার কাজে শহরে এলে তার দোকানে যেতাম। অনেক বড়লোক। অনেক বড় ব্যবসা। আমি জানতাম তার এক বোন মাদরাসায় পড়ে। সময় বুঝে একদিন তার কাছে বিয়ের কথা বললাম। বন্ধু আমার কথা শুনে প্রথমে ভুল বুঝল। সে মনে করেছিল, আমি তার বোনের ব্যাপারে আগ্রহী। সে ভুল ভাঙতে দেরি হলো না। বললাম,
-ভাই, আপনার বোনের একটু সহযোগিতা লাগবে।
-কেমন?
-আমার এমন একটা পাত্রীর প্রয়োজন, যে মাদরাসায় পড়ে বা পড়ায়। কিন্তু বিয়ে আটকে আছে। গরিব। অসহায়। এতিম। ভিটেমাটি ছাড়া।

* * *

বন্ধুটি ভীষণ অবাক হলেও, আমাকে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দিল। মাস খানেক পরেই কাঙ্ক্ষিত সংবাদ মিলল। এর মধ্যে অবশ্য মাদরাসার আশপাশ থেকেও কিছু প্রস্তাব এসেছিল। সেগুলো গ্রহণ করলে, 'বউয়ের পাশাপাশি, আমার দুনিয়াবী অনেক হালাল চাহিদাও পূরণ হয়ে যেত। এমনকি আমার মা-বাবার ভিটেও পুনরায় কেনার আর্থিক সংগতি হয়ে যেত। কিন্তু আমি নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলাম। আমার এটুকু দৃঢ় বিশ্বাস আছে, টাকা-পয়সার জোগানদাতা বান্দা নয়, আল্লাহ। আমাদের হাটহাজারীর বাবা হুজুরের কাছে এ কথাটা বার বার শুনেছি।

* * *

বন্ধুর বোনের মারফতই পাত্রীর খবর পেলাম। শেষের দিকে কেন যেন বন্ধুর মা এবং বোনও আমার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে নিমরাজি হয়ে গিয়েছিল। হাবভাবে বুঝতে পারতাম, বন্ধুও গররাজি ছিল না। লোভ জাগেনি তা বলব না। মনকে কঠোরভাবে শাসিয়ে দমন করলাম। আমি আমার 'শুকরিয়াজ্ঞাপন' পদ্ধতি থেকে একচুলও নড়লাম না।

* * *

আমার স্ত্রী হাফেযা। টাকা-পয়সার অভাবে সেও পড়ালেখা করতে পারেনি। তারও ইহজনমে কেউ নেই। বাড়িঘর নেই। অবাক হয়ে দেখলাম, তার অবস্থা আমার চেয়ে হাজার গুণ খারাপ। আমি তো তাও মায়ের আদর পেয়েছি। সে তাও পায়নি। তার পুরো ইতিহাস বলতে গেলে রাত ফুরিয়ে যাবে। তার জন্মের পর পরই তার মা মারা গিয়েছিলেন। চাচির কাছেই মানুষ। বাবা আগেই মারা গিয়েছিলেন। নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে কীভাবে যেন মাদরাসায় কাজে যোগ দিয়েছিল। সেখানেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছাত্রীদের পড়া শুনতে শুনতে সেও রীতিমতো হাফেযা বনে গেল! দয়া করে তাকে ফ্রি ছাত্রী হিশেবে ভর্তি করিয়ে নেয়া হলো।

* * *

ছাত্রী হলেও মাদরাসার কাজ করে দিত। রান্নার কাজ সে প্রায় একাই করত। এদিকে লেখাপড়াও কামাই যেতে দেয়নি। হিফযের শুনানি শেষ হওয়ার পর, মাদরাসার বড় খালা দয়া করে তাকে হেফযখানায় শিক্ষিকা হিশেবে নিয়োগ দিয়েছেন। খুবই অল্প বয়েসে। প্রথম প্রথম বেতন পেত না। এখন অবশ্য দেড় হাজার টাকা করে পায়। এ সামান্য বেতনেও সে কী যে খুশি! অথচ চব্বিশ ঘণ্টার খেদমত। আমরা দুজনেই টাকা জমাচ্ছি। আমাদের আগের বাড়িটা কেনার ইচ্ছে। ইনশা আল্লাহ ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

* * *

বাড়তি কোনোরকম আয়োজন ছাড়াই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। কোথাও নিজস্ব ঘর না থাকায় বাসর হলো না। পরে বন্ধুটি দয়াপরবশ হয়ে বিয়ের এক সপ্তাহ পর তাদের বাড়িতে দুদিন থাকার সুযোগ করে দিয়েছিল।

* * *

এখন আমরা শুধু কথা বলি। মাঝেমধ্যে গিয়ে তার মাদরাসায় দেখা করে আসি। আজই প্রথম বারের মতো তাকে নিয়ে বাইরে বের হয়েছি। এরপর মাদরাসার টাকা কালেকশনে চট্টগ্রামে চলে যাব। ঈদের আগে আর দেখা হবে না।

* * *

আপনাদের দাওয়াত গ্রহণ করতে পারলাম না বলে রাগ করবেন না। 'ও' তাদের মাদরাসার 'রান্না-খালা'-কে অনেক বলে কয়ে, কাকুতি-মিনতি করে, এক ঘণ্টার জন্যে গ্যাসের চুলোটা খালি পেয়েছে। সে নিজ হাতে আমার জন্যে কিছু একটা তৈরি করে এনেছে।

জানেন, সে খুবই ভালো রান্না করতে পারে। হাফেযা হওয়ার পর, সে শিক্ষকতার পাশাপাশি কয়েক বছর 'রান্না-আপু'-এর চাকরি করেছিল। তখনই সে মূলত অনেক রান্না করতে শিখে।

* * *

আজান হয়ে গেল। হুযুর তড়িঘড়ি চলে গেলেন। আমরা জেলার বিখ্যাত জিলিপি হাতে বসে রইলাম। স্তব্ধ। নির্বাক। অশ্রুসজল। একজন এতিম গরিব মেয়ে যে বিয়ের সময় কতটা অসহায় আর বিপন্ন বোধ করে সেটা ভালোভাবেই জানা আছে।

* * *

মাগরিবের পর, দুজন যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল, যতদূর দৃষ্টি যায় আমরা তাকিয়ে ছিলাম। আমাদের মুখ দিয়ে কোনো কথা সরছিল না। একটা মানুষ কতটা মানবিক হলে, এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পারে?

* * *

অসম্ভব শ্রদ্ধাবোধ জেগে উঠল। এমন মানুষের দেখা পাওয়াও পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। আশার কথা, কওমী মাদরাসায় এমন মানুষের সংখ্যা বিরল নয়। হয়তো সমাজেও!

আমাদের আলাপচারিতায় কয়েকটা প্রশ্ন উঠে এসেছিল :

ক. দুজনে একজন আরেকজনকে কতটা ভালোবাসে?

খ. আমাদের কারও পক্ষে এতটা ত্যাগ করা কি সম্ভব ছিল?

গ. এত কষ্ট করে কি আমরা দ্বীনের পথে টিকে থাকতাম?

জীবন জাগার গল্প : ৬৭৪

জান্নাতমহল

পাশের ভাড়াটিয়া। এ পাড়ায় নতুন এসেছেন। পরিচিত হতে এলেন। এ ঘরের বাচ্চাগুলোকে অন্য সবার চেয়ে আলাদা মনে হয়। চোখে পড়ে। ভদ্র আর শান্তশিষ্ট। এ নিয়ে তার কৌতূহলের অন্ত নেই। আশেপাশে আরও বাড়িতেও এ ক'দিনে যাওয়া হয়েছে। গিন্নিদের সাথে গল্পগাছা হয়েছে।

মেজবান হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বসালেন। ঘরের সাজানো-গোছানো পরিবেশ দেখে, মেহমানের চোখ জুড়িয়ে গেল। চারটা ফুটফুটে বাচ্চা। তিনটা ঘর জুড়ে হুটোপুটি করছে। বেড়াল ছানার মতো। তৃতীয় বাচ্চাটার বয়েস তিন কি চার হবে। জড়ানো আদুরেকণ্ঠে বলে উঠল :

-আম্মু, আজ জান্নাতে ঘর বানাবে না?

তার দেখাদেখি বাকি দুজনও বলতে শুরু করল :

-আম্মু, আজ জান্নাতে ঘর বানাবে না?

মেহমান অবাক হলেন। এত ছোট্ট পিচ্চি এটা কী বলছে? জান্নাতে ঘর কীভাবে বানাবে? মেজবানকে প্রশ্ন করলেন :

-'জান্নাতে ঘর বানানো' ব্যাপারটা কী?

শুনে মেজবানের মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠল। শরবতের গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বললেন :

-একটু অপেক্ষা করুন! নিজের চোখেই দেখে যাবেন ব্যাপারটা! ওটা আমাদের ছানাদের ঘরোয়া খেলা!

* * *

মা হাতের কাজটা গুছিয়ে এলেন। মেহমানকে হালকা নাশতা দিলেন। তারপর কোলেরটাকে নিয়ে মেঝেতে বসে গেলেন। বড় মেয়ে আর ছোট দু-ভাই মাকে ঘিরে বসল। সবার চোখ-মুখ থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা ঠিকরে বেরুচ্ছে!

-এক দুই তিন! শুরু 'জান্নাতমহল' নির্মা-া-া-াণ!

তিন কচিকাঁচা একসাথে কোরাস করে সূরা ইখলাস পড়তে শুরু করল। পড়া শেষ হলো! একে একে দশ বার পড়া হলো। পড়া শেষ করে সবাই সমস্বরে হই হই করে উঠল :

-আলহামদুলিল্লাহ! আমরা জান্নাতে একটা প্রাসাদ বানিয়েছি।

-খুব ভালো করেছ! এবার বলো তো বাছারা, তোমরা এই প্রাসাদে কী রাখতে চাও?

-কুনূজ! ধনভাণ্ডার রাখতে চাই, আম্মু!
-ঠিক আছে রাখো!
-লা হাওলা ওয়া লা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! লা হাওলা ...!
-ওমা, কী বড় কুনূয বানিয়েছ! আচ্ছা, এবার বলো তো, কাকে বেশি ভালোবাসো?
-আল্লাহকে!
-তারপর?
-আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে।
-কেয়ামতের দিন সবার কেমন লাগবে?
-ভীষণ পিপাসা লাগবে!
-আর কী লাগবে?
-নবীজির সুপারিশ লাগবে!
-তোমরা কি সেদিন সুপারিশ আর পানি পেতে চাও?
-জি চাই!
-তা হলে?
-আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ...ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।
-আচ্ছা, কার কার জান্নাতে বাগান করার শখ?
-আমার! আমার আমার!
-তা হলে?
-সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!
বাচ্চারা একে একে আরও যিকির করে গেল। একসময় শেষ হলো যিকির যিকির খেলা। এবার সবাই আগের হুটোপুটিতে ফিরে গেল।

* * *

মেজবানের দু-চোখ কপালে। এত সুন্দর খেলার কথা তার কল্পনাতেও আসেনি কখনো। তার ছেলে-মেয়েগুলো যিকির দূরের কথা 'নবীজি' কে সেটাও ঠিকমতো বলতে পারবে কি না ঘোরতর সন্দেহ! তাদের বাবাটাও কি! নিজেও ধর্মকর্মের ধার ধারবে না, অন্যদেরও ধর্ম পালন করতে দেবে না। তার কথা হলো, কী দরকার এসব! বুড়ো হলে তখন দেখা যাবে! এমন যার মনোভাব, তার ছেলেমেয়েরা আল্লাহ-রাসূল চিনবে কী করে!
-আপা, কীভাবে তাদের এভাবে গড়ে তুললেন? আমারগুলো তো আরবী অক্ষরই চেনে না!

-ছোটরা গল্প শুনতে ভালোবাসে! খেলাধুলা করতে পছন্দ করে। ছোটবেলা থেকেই ওদের খেলাচ্ছলে, গল্পচ্ছলে এসব শিক্ষা দিয়েছি। সহজ সহজ আয়াতের অর্থ শুনিয়েছি। সহজ সহজ হাদীস শুনিয়েছি। বিভিন্ন যিকির শিখিয়েছি। মাসনুন দু'আগুলো শিখিয়েছি। সাথে সাথে কোন আমলের কী লাভ, সেটা শিখিয়েছি!

-আমার ঘরে যে এমন করা অসম্ভব! আমার কী হবে? আমি নিজেও ধর্মকর্ম করি না! বুঝিও না! তবে এটুকু বুঝি, এটা করা দরকার!

-সন্তানকে মানুষ করতে হলে, সবচেয়ে বেশি দরকার মা-বাবার দু'আ। নবীগণও যেখানে সন্তানের জন্যে দু'আ করেছেন, আমাদের সাধারণ মানুষের কেমন করা উচিত বুঝে দেখুন!

-কী দু'আ করতে পারি!

-আপনি তাদের যেমনটা গড়তে চান, সেই দু'আ করবেন। নেককার হওয়ার দু'আ করবেন! তা ছাড়া বাচ্চাদের আব্বু আর আমি মিলে কিছু নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করি! সন্তান মানুষ করতে হলে কিছু কষ্ট তো স্বীকার করতেই হয়!

-নিয়মগুলো?

-তেমন কঠিন কিছু নয়। যেমন :

এক. আমরা বাইরের কারও সামনে তাদের জামা-কাপড় পরাই না। এমনকি ভাইবোনদের সামনেও না। একটু বুঝ হওয়ার পর থেকেই চেষ্টা করে আসছি, তাদের 'সতর' যেন কেউ না দেখে। নিজেরাই যেন আড়ালে গিয়ে পোশাক পরতে পারে। আমরা নিজেরাও তাদের সামনে নিজের পোশাক বদলাই না। সেই দুই বছর বয়েস থেকে।

দুই. হাম্মামে গেলে যেন নিজেই ছুছু দিতে পারে! এটা ওদের বার বার বলে বলে অভ্যস্ত করেছি। প্রথম দিকে আমরা চোখ বন্ধ করে ওদের ছুছু করিয়েছি। তাদের বলেছি, অন্য কেউ সতর দেখা ঠিক নয়। এটা শরমের। আমরা নিজেরা হাম্মামে গেলে দরজা বন্ধ করি। তাদেরও ছোটবেলা থেকে উদ্বুদ্ধ করেছি। প্রথম দিকে দরজাটা শুধু ভেজানো থাকত, ছিটকিনি লাগিয়ে বন্ধ করা হতো না, কারণ তারা ছিটকিনির নাগাল পেত না। ওদের আব্বু, আমাকে বার বার বলতেন :

-ওদের লজ্জা শেখাও! শরম শেখাও!

আমি প্রথম প্রথম অবাক হয়ে জানতে চাইতাম :

-শরম বুঝি শেখানো যায়!

-কেন যাবে না, অবশ্যই শেখানো যায়! শরম শেখানো মানে, শরম কাকে বলে, সেটা ছানাদের বোঝানো, অনুভব করানো!

তিন. বাড়িতে মেহমান এলে তাদের সাথে কোনো বাচ্চাকে ঘুমুতে দেয়ার ব্যাপারেও ওদের আব্বুর ঘোরতর আপত্তি। এমনও হয়েছে, আমরা সবাই একটা ঘরে ফ্লোরিং করেছি। মেহমান মনক্ষুণ্ন হয়েছে, কিন্তু তাদের বাবা বিনয়ের সাথে এড়িয়ে গেছেন। আবার এটাও খেয়াল রাখতে হবে, সন্তান যেন আলাদা রুমে একাকী রাত না কাটায়।

চার. বাড়িতে কোনো পুরুষ মেহমান এলে তিনি খেয়াল রাখতেন, তারা যেন তার কোলে না বসে। বিশেষ করে দুই পায়ের ওপর বা মাঝে না বসে।

পাঁচ. মুখে বা ঠোঁটে চুমু খেতে বারণ করতেন। বেশির চেয়ে বেশি কপালে হতে পারে। তাও একদম ছোটবেলায়। শিশুকেও অন্য কাউকে চুমু খেতে জোরাজুরি না করা। কারও কোলে বসতে না চাইলে জোরাজুরি করে না বসানো।

ছয়. তেল বা লোশন লাগানোর সময়, তাদের লজ্জাস্থানে যতটা সম্ভব আলগোছে তেল-লোশন মেখে চলে যাওয়া। হালকার চেয়ে বেশি চাপ না দেয়া। এ কাজ যদ্দূর সম্ভব নিজেরাই করা। খেয়াল রাখা, লজ্জাস্থানের সেনসিটিভিটি (স্পর্শকাতরতা) যেন পুরোই অক্ষত থাকে। ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্যেই এটা প্রযোজ্য।

সাত. হারাম বা গুনাহ করতে পারে, এমন কোনো সুযোগ-ফুরসতই তাকে না দেয়া। তাকে তার মতোই থাকতে দেয়া, তবে সব সময় একটা চোখ তার প্রতি নিবদ্ধ রাখা। ভাই-চাচা-মামা কারও হাতেই পুরোপুরি ছেড়ে না দেয়া। এমনকি তার সমবয়েসী বন্ধুর সাথেও না। অল্প সময়ের জন্যে হতে পারে। তবে সে অল্প সময়টা নিয়মিত হয়ে গেলে, ভিন্ন সুযোগগ্রহণের আশঙ্কাও থাকে। সচেতন থাকা।

আট. শিশুদের সাথে সম্পর্কটাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা। সে যেন সবকিছু মন খুলে বলতে পারে। দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই। সন্তানের সাথে বেশি বেশি সময় কাটানো।

নয়. শিশুকে বাসায় একা রেখে কোথাও না যাওয়া। এমনকি পরিচারিকার সাথে রেখেও না। এমন ঘটনাও ঘটেছে, মা গেছেন ধর্মসভায়! ছেলে আর মেয়েকে রেখে গেছেন 'খাদেমা'র কাছে। পরবর্তীতে কোনো কারণে খাদেমাকে চাকরিচ্যুত করা হলো। একদিন মা বাইরে থেকে এসে দেখল ছেলেটা তার বোনের সাথে দুর্ব্যবহার করছে। জিজ্ঞেস

করলে ছেলে জানাল, সে খাদেমার সাথেও এমন করত। খাদেমাই তাকে এমনটা করতে শিখিয়েছে। সন্তানের মুখের ভাষা, চিন্তা, আচরণ বাবা-মায়ের চেয়ে বাড়ির কাজের লোক দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়।

দশ. যদ্দূর সম্ভব কার্টুন দেখা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। কারণ, এটা থেকেই ভবিষ্যতে 'গুনাহ' দেখার পথ তৈরি হতে থাকে। মানসিক প্রস্তুতি শুরু হতে থাকে। শিশুর মনের সৌন্দর্য নষ্ট করতে পারে এমন বই, বন্ধু, আত্মীয়কে মনে মনে কালো তালিকাভুক্ত করা। এগুলো থেকে শিশুকে দূরে সরিয়ে রাখা। এগুলোর প্রতি শিশুকে অনাগ্রহী করে তোলা।

এগারো. এমনকি বাসা-বাড়িতে লিফট থাকলে সেখানে তাকে একা একা চড়তে না দেয়া। অন্য কোনো লোক থাকলে তো প্রশ্নই আসে না। এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, শহরে অনেক সন্তান লিফটেই প্রথম ভিন্নধর্মী আচরণের মুখোমুখি হয়।

বারো. গণজমায়েত, অন্ধকার স্থান ও পরিত্যক্ত স্থানে সন্তানকে যেতে না দেয়া। বর্তমানের বিনোদনকেন্দ্রগুলোর ব্যাপারেও সতর্ক থাকা। শিশুমনে পাপের দৃশ্যগুলো গভীর রেখাপাত করে। দুজনের হাত ধরাধরি করে হাঁটার জীবন্ত দৃশ্য, পর্দায় অভব্য ছবি দেখার চেয়েও মারাত্মক। তার অবচেতন মনে অনুসিদ্ধান্ত তৈরি হতে থাকে, এভাবে দুজন নারী-পুরুষ হাত ধরাধরি করে হাঁটা বা একান্তে বসে থাকা বৈধ!!!

তেরো. ছেলে হলে মেয়ে শিক্ষক আর মেয়ে হলে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দান শত ভাগ পরিহার করে চলা। এমনকি শিক্ষাদানটা পর্দার আড়াল থেকে হলেও নিরাপদ মনে না করা।

চৌদ্দ. অপরিচিত কারও দেয়া কিছু না খাওয়া। জোর করলেও না। ভদ্রভাবে না বলে দেয়া।

পনেরো. আব্বু-আম্মুর অনুমতি ছাড়া ঘরের দরজা না খোলা। পরিচিত কেউ হলেও না।

ষোলো. বার বার বলে দেয়া, আব্বু-আম্মু ছাড়া অন্য কেউ কিছু শেখাতে চাইলে সেটা যেন বাড়িতে এসে জানায়। যে শিক্ষকের কাছে যা শিখতে পাঠানো হয়েছে, এর বাইরে কিছু শিখছে কি না, খোঁজ রাখা। শিক্ষক হলেই তিনি শত ভাগ 'আস্থাভাজন' হবেন, এমন নয়। হালের অনেক শিক্ষক থেকেও ছাত্ররা 'ভিন্ন' কিছুর পাঠ পায়। মেমোরি কার্ডে। পেনড্রাইভে।

সতেরো. নিজেদের মধ্যে ভাব আদান-প্রদানের জন্যে একটা নিজস্ব ভাষা তৈরি করা। পাসওয়ার্ডের মতো। অন্য কেউ তাকে স্কুল থেকে

আনতে গেলে, পাসওয়ার্ড বলতে না পারলে তাকে যেন বিশ্বাস না করে।

আঠারো. বাড়াবাড়ি পরিহার করা। আদর ও শাসন উভয় ক্ষেত্রে।

উনিশ. বড় কেউ নিজের সন্তানকে আদর করে, 'আমার বউ' বা 'আমার জামাই' বললে সেটা করতে নিষেধ করা । এমনকি অন্য কেউ ছেলেকে 'আমার মেয়ের জামাই' অথবা মেয়েকে 'আমার ছেলের বউ' বলাকেও প্রশ্রয় না দেয়া। এতে কচিমনে ভিন্ন প্রভাব পড়ে।

বিশ. স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না এমন কারও সাথে কোথাও যেতে শিশুকে জোর না করা। পাশাপাশি খেয়াল রাখা, শিশুটা বিশেষ কোনো প্রাপ্তবয়স্কের ভক্ত হয়ে উঠেছে কি না। তার কথা বেশি বেশি বলে কি না।

একুশ. সব সময় হাসিখুশি থাকে এমন শিশু হঠাৎ নির্জীব ও মনমরা হয়ে গেলে, কারণটা বের করার চেষ্টা করা। কেউ তার সাথে দুর্ব্যবহার করে ফেলেনি তো!

বাইশ. সন্তানের বয়ঃসন্ধিতে শরীর সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা। নইলে অন্য কেউ তাকে ভুল শিখিয়ে দেয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। পাশাপাশি খেয়াল রাখা, কারও কাছ থেকে নেতিবাচক কিছু শিখছে না তো! এ বয়সের মাসআলাগুলো জানার ব্যবস্থা করা।

তেইশ. ছোট সন্তানকে কম্পিউটার, মোবাইল লাগামহীনভাবে দিয়ে না দেয়া। নিতান্ত প্রয়োজনেই শুধু ব্যবহার করতে দেয়া। তাও সরাসরি তত্ত্বাবধানে।

চব্বিশ. শিশু কারও সম্পর্কে অভিযোগ করলে বিষয়টা সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে খতিয়ে দেখা।

পঁচিশ. সন্তানের জন্যে কুরআন কারীমের দু'আগুলো বেশি বেশি পড়া। বাবা ও মা উভয়ে। মাঝেমধ্যে সন্তানদের সাথে নিয়েও দু'আগুলো পড়া। প্রতিটি দু'আর অর্থ তাদের শিখিয়ে দেয়া। যাতে তারা বুঝতে পারে, আব্বু আম্মু তাদের জন্যে কী দু'আ করছেন! তারা কোন দু'আয় আমীন বলছে! যেমন :

১.

أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي

আমার জন্যে আমার সন্তানদের যোগ্য করে গড়ে তুলুন।

-আহকাফ (৪৬ : ১৫)

২.

إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(ইয়া রাব), আমি তাকে ও তার বংশধরগণকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজতের জন্যে আপনার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম।

-আলে ইমরান (০৩ : ৩৬)

৩.

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের দান করুন নয়নপ্রীতি এবং আমাদের মুত্তাকীদের নেতা বানান। -ফুরকান (২৫ : ৭৪)

৪.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

হে আমার প্রতিপালক, আমাকেও নামায কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার আওলাদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম করবে)। হে আমাদের প্রতিপালক, এবং আমার দু'আ কবুল করে নিন।-ইবরাহীম (১৪: ৪০)

৫.

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের আপনার একান্ত অনুগত বানিয়ে নিন এবং আমাদের বংশধরদের মধ্যেও এমন উম্মত সৃষ্টি করুন, যারা আপনার একান্ত অনুগত হবে। আর আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা দিন এবং আমাদের তওবা কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি আর কেবল আপনিই ক্ষমাপ্রবণ (এবং) অতিশয় দয়ার মালিক।-বাকারা (০২ : ১২৮)

৬.

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةًإِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাকে আপনার নিকট হতে কোনো পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দু'আ শ্রবণকারী।

-আলে ইমরান (৩ : ৩৮)

৭.

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ

(ইয়া রাব), আমাকে ও আমার পুত্রকে মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করুন। -ইবরাহীম (১৪ : ৩৫)

জীবন জাগার গল্প : ৬৭৫

আল্লাহর পরীক্ষা

মানুষটার জীবন বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিল। এখনো সন্তান ঘরে আসেনি। নতুন জীবনের রেশ লেগে আছে প্রতিটি পরতে পরতে। বউকে নিয়ে ঘুরতে গেল একটা পাহাড়ি বাগানবাড়িতে। রান্নাবান্নার আয়োজন আগেই করা ছিল। ঠিকে ঝি সবকিছু গুছিয়ে রেখে গেছে। নিজেদের কুটোটিও নাড়তে হবে না।

* * *

খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম সেরে বেলা পড়ে এলে, দুটিতে মিলে ঘুরতে বের হলো। হাঁটতে হাঁটতে বাংলো ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেল। সন্ধ্যা তখন প্রায় পুরোই ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু তারা বিভোর হয়ে বেড়ানোর কারণে টের পেল না। সংবিৎ ফিরে পেতে ফিরতি পথ ধরল। নিবাসের কাছাকাছি আসার পর, স্বামী পায়ের নিচে নরম কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটা সাপ পায়ে তীব্র বেগে ছোবল হানল।

* * *

দংশিত পা নিয়েই শঙ্কিত মনে ডেরায় ফিরল। ততক্ষণে পা ফুলে গেছে। ব্যথাও সমানতালে বাড়ছে। রাতটা কাটল অসহায়ভাবে। ঠিকে ঝিয়ের পরামর্শে স্ত্রী স্বামীর পায়ে রশি বেঁধে দিল। কিন্তু কিছু হলো না। পায়ে তেল মালিশ করা হলো। অসহ্য ব্যথায় মানুষটা সারা রাত গুমরে গুমরে কাঁদল। সকালের দিকে গোঙাতে গোঙাতে বেহুঁশ হয়ে গেল। দিনের আলো ফুটতেই গাড়ির ব্যবস্থা করে, শহরে নিয়ে আসা হলো। ডাক্তার বললেন, এখন আর কিছুই করার নেই। পা'টা অচল হয়ে গেছে। সাপের বিষ শরীরে ছড়িয়ে গেছে। আস্তে আস্তে অন্য জায়গাতেও প্রকোপ দেখা দেবে।

* * *

ডাক্তার কথা হুবহু ফলে গেল। একে একে দুই পা আর একটা হাত অবশ হয়ে গেল। কথায়ও জড়তা দেখা দিল। হাঁটা-চলা তো বহু আগেই লোপ পেয়েছে। স্ত্রী অসামান্য উদারতা দেখিয়ে স্বামীর সেবা করে যেতে লাগল। ধরাধরি করেই সবকিছু করাতে হয়।

* * *

একদিন বাড়িতে এল পাশের বাড়ির এক মহিলা। স্বামীর অবস্থা দেখে, সান্ত্বনা দিয়ে বলল :

-এভাবেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেবে?

-তো কী করব?

-অন্য কোথাও নতুন করে শুরু করতে পার।

-আপনার পরামর্শটা ভালো। তবে একজন মানুষকে এভাবে ফেলে চলে যাওয়াটা মানবিক ব্যাপার নয়। এটাও ঠিক, মানুষটাকে জীবিতও বলা যায় না, যাকে নিয়ে অন্তত ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন দেখতে পারি। আবার মৃতও নয়; নতুন কিছু করতে পারি। তারপরও আমি হতাশ নই। আল্লাহর রহমতের আশা করি।

* * *

দুজনে ঘরের বাইরে আলাপ করলেও কথার টুকরা আওয়াজ স্বামীর কানে আসছিল। তারা ভেবেছিল স্বামী ঘুমিয়ে আছে। তাই কথার আওয়াজ নিচু করার প্রয়োজন বোধ করেনি। আলাপচারিতা শোনার পর স্বামীর মনে উথাল-পাতাল অবস্থা শুরু হলো। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। আল্লাহর কাছে এত দিন হরদমই দু'আ করে এসেছে। আজ আবেগের আতিশয্যে আরও বেশি কায়মনোবাক্যে দু'আয় নিমগ্ন হলো। শুয়ে শুয়েই।

* * *

মনের সীমাহীন অস্থিরতার কথা স্ত্রীকে টের পেতে দিল না। একটানা দু'আ করেই গেল। তার বেশি কষ্ট ছিল স্ত্রীর জন্যে। মানুষটা সত্যি সত্যি তার জন্যে অবিশ্বাস্য ত্যাগ করে চলেছে। অল্প ক'টা দিনের পরিচয়ে এভাবে ভালোবাসা দেখানোর কথা নয়। একটা মানুষ কত বড় হৃদয়ের অধিকারী হলে, এভাবে নিজের সুন্দর ভবিষ্যৎকে আরেক জনের জন্যে বিলিয়ে দিতে পারে! কোনো বিনিময় ছাড়াই! বিন্দুমাত্র প্রাপ্তি ছাড়াই!

* * *

রাতের খাবার শেষে স্ত্রী সারাদিনের কর্ম-ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। স্বামী তখনো দু'আয় নিমগ্ন। রাত তখন গভীর! স্বামীর চোখ বেয়ে অঝোরে পানি ঝরছে। দুই ঠোঁট বিড়বিড় করে দু'আ-বাক্য উচ্চারণ করে যাচ্ছে। শেষরাতের দিকে চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এল!

* * *

ফজরের আযান শুনে অন্য দিনের মতো স্ত্রী ঘুম থেকে উঠল। ওযু করে নামায পড়ে স্বামীকেও জাগাল। ধরে ধরে বসাল। স্ত্রীর কাছে আজ কেমন যেন অন্যরকম লাগছে। স্বামীকে অন্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি পাতলা মনে হলো তার কাছে। থাকতে না পেরে বিষয়টা খুলেই বলল। স্বামীও কিছু একটা ভাবছিল।

-তাই তো, আমার কাছেও নিজেকে কেমন হালকা হালকা লাগছে! মনে হচ্ছে আমি আগের মতো হয়ে গেছি।

-সত্যি মনে হচ্ছে? তা হলে আল্লাহ আমাদের দু'আ শুনেছেন। বিসমিল্লাহ বলে দাঁড়াও তো, আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি!

* * *

স্বামী কিছুটা আশা, কিছুটা নিরাশা নিয়ে পা বাড়াল। স্ত্রী হাত বাগিয়ে থাকল। পড়ে গেলে যেন ধরে ফেলতে পারে। নাহ, তাকে আর ধরতে হলো না! আল্লাহ দুজনের কষ্টের দিন পার করে, সুখের দিন এনে দিয়েছেন। রাব্বে কারীম বান্দাকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন। যাচাই করেন, কারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস টিকিয়ে রাখতে পারে।

জীবন জাগার গল্প : ৬৭৬

গৃহ-সংবিধান

আমি আমীন আল ফকীহ। ইয়ামানের রাজধানী সানায় থাকি। একটা কনসালটেন্সি ফার্ম নিয়ে আছি। আমাদের ফার্মটা অনলাইনভিত্তিক হলেও অফলাইনেও কাজের পরিধি বেশ বিস্তৃতই বলা চলে। রাজনৈতিক ডামাডোলে আমাদের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটলেও, ফার্মের পথচলা থেমে নেই। ফার্মের দুটি দিক :

ক. ব্যবসায়িক দিক।

খ. সেবার দিক।

সেবার আওতায় আমরা সপ্তাহের একদিন বিভিন্ন স্কুলে টিম নিয়ে হাজির হই। সেখানকার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা দেখি। ছাত্র-শিক্ষক থেকে শুরু করে দপ্তরি-দারোয়ান সবার সাথে কথা বলি। কমিটির সাথে বৈঠক করি। বোঝার চেষ্টা করি, স্কুলের ভালো দিক, মন্দ দিক। বিদায়ের আগে আমরা কিছু পরামর্শ দিয়ে আসি। অনেকটা নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো! প্রথম দিকে আমাদের পরামর্শ কেউ গ্রহণ করত, কেউ করত না।

কিছু স্কুল বোর্ড পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে শুরু করলে অনেকের টনক নড়ল। এবার নিজেরাই আমাদের দাওয়াত দিতে শুরু করল। একটা স্কুলে গেলাম। বার্ষিক অনুষ্ঠান। অভিভাবকদেরও দাওয়াত করা হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রথমে কিছু কথা বললেন। আমার ভালো লাগল।

-কয়েকদিন পরে ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবে। আমি অভিভাবকদের উদ্দেশ্য করে কয়েকটা কথা বলতে চাই :

১. আপনারা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন থাকেন। তারা কীভাবে ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করতে পারে, সে নিয়ে নানা চেষ্টা-তদবির করেন। এটা খারাপ নয়। ভালো।

২. একটা কথা সবার ভালোভাবে মনে রাখা দরকার : আমাদের সন্তানরা স্কুলে কতকিছু পড়ে। অংক, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি। তাদের কেউ হয়তো জীবনে সফল ব্যবসায়ী হবে। এখন যে সে প্রতিবছর সাহিত্য পড়ছে, এটা তার ব্যবসার কাজে কী উপকার বয়ে আনবে? আরেকজন হয়তো লেখক হবে, তার পেশাগত জীবনে রসায়ন কী কাজে লাগবে? কেউ হয়তো শরীরচর্চার শিক্ষক হবে, তার জীবনে অঙ্ক কী কাজে লাগবে?

৩. সন্তান পরীক্ষায় ভালো করলে তাকে সংবর্ধিত করব। ব্যর্থ হলে তাকে আশ্বস্ত করতে হবে, সবকিছুর পরও 'আমরা তোমাকে ভালোবাসি! তুমি আমাদের সন্তান'। এমন কিছু বলা যাবে না, যাতে তার মন ভেঙে যায়। তুমি পরীক্ষায় পাশ করতে ব্যর্থ হয়েছ, এমন কথা তাকে বলাই যাবে না। একটা পরীক্ষায় ফেল করলে, একটা বিষয়ে কম নম্বর পেলে, কারও জীবন ধূলিসাৎ হয়ে যায় না। কাউকে ব্যর্থ বলার উপযোগিতা তৈরি হয়ে যায় না।

৪. পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেলেই কেউ সফল হয়ে যায় না। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হলেই কেউ সুখী হয়ে যায় না। যারা চেষ্টা-পরিশ্রম করে কৃতকার্য হয়েছে, আমি তাদের খাটো করে দেখছি না। অধ্যবসায়ী হতেও নিরুৎসাহিত করছি না কাউকে।

* * *

প্রধান শিক্ষকের কথাগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলাম। এমন শিক্ষক থাকলে, আমাদের মতো ফার্মের আসার প্রয়োজন নেই। এ লোকের কথাগুলো স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। তার সাথে আমিও কিছু কথা যোগ করেছিলাম :

১. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মতান্ত্রিক পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে কারও প্রকৃত ক্ষমতা বোঝা যায় না।

২. হ্যাঁ, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভালো ফলাফল করতে পারা চমৎকার একটা অর্জন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও মানুষ গড়ার সুন্দরতম কারখানা। তবে অসুন্দর হলো, পরীক্ষার নম্বর দিয়ে কোমলমতি শিশুদের মাপা। এটা অনেকটা শীলনোড়া দিয়ে পণ্য মাপার মতো হয়ে যায়।

৩. একজন সন্তানই মাতা-পিতার মূল গর্বের বিষয় হওয়া কর্তব্য। একজন শিকারি তার শিকার নিয়ে গর্ব করে। একজন কৃষক তার অর্জিত ফসল নিয়ে গর্ব করে। একজন সাহিত্যিক তার সাহিত্যকর্ম নিয়ে গর্ব করে। তা হলে খোদ মানুষ জন্ম দিয়ে কেন গর্বিত হবে না?

৪. আমি অস্বীকার করছি না, একজন পিতার দায়িত্ব হলো, সন্তানকে সংগ্রাম-সাধনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলা। পড়ালেখায় মনোযোগী করে তোলা! কিন্তু সন্তানকে পরীক্ষার নম্বর দিয়ে যাচাই করা একজন প্রকৃত পিতার কাজ হতে পারে না। সন্তানের ঘাড়ে জোর করে কিছু চাপিয়ে দেয়াও বুদ্ধিমান পিতার কাজ হতে পারে না। একজন জ্ঞানী পিতা মনে করে না, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই ব্যুৎপত্তি অর্জনের একমাত্র মাধ্যম। সুখময় জীবন গড়ার অব্যর্থ উপায়!

৫. কিছু মানুষের বদ্ধমূল ধারণা—প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ ডিগ্রিই বিত্ত-বৈভব অর্জনের চাবিকাঠি! তাদের মনে রাখা উচিত, একজন অশিক্ষিত বিখ্যাত খেলোয়াড়, একটা ম্যাচ খেলেই যে টাকা পায়, অনেক ডাক্তার পুরো মাসেও তার সিকিভাগ আয় করতে পারে না। একজন সুকণ্ঠী গায়িকা একটা শো থেকে যা আয় করে, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক মিলে একমাসে তা আয় করতে পারে না। সুতরাং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথেই বিত্তের একমাত্র সম্পর্ক, এমন নয়।

৬. ইতিহাস বদলে দেয়া ব্যক্তিদের অধিকাংশই কোনো প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন না। ইবনে সিনা কোনো মেডিক্যাল কলেজে পড়েননি। অথচ তিনি আজ বেঁচে থাকলে, বিশ্বের সেরা চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিশেবে বরিত হতেন। আল্লামা সিবাওয়াইহ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলমুন নাহব (আরবী ব্যাকরণ) পড়েননি! উমর ইবনুল খাত্তাব রা. কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়েননি। খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কোনো ক্যাডেট কলেজে পড়েননি।

* * *

আমাদের তিন সন্তান। আমি আর আমীনা (বাচ্চাদের মা) মিলে ঠিক করেছি, আমাদের সন্তানদের আদর্শ সন্তান হিশেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করব। আমরা দুজন মিলে অনেক পরামর্শ করে কিছু বিষয় ঠিক করেছি। বাচ্চাদের সাথেও পরামর্শ করেছি। সবার সম্মিলিত উদ্যোগেই তৈরি হয়েছে আমাদের 'গৃহ-সংবিধান'। মূল পর্বে যাওয়ার আগে কিছু কথা বলে নেয়া জরুরি :

১. সংবিধানটা শুধুই আমাদের বাচ্চাদের সামনে রেখে তৈরি করা হয়েছে। সবার ক্ষেত্রে সমান কার্যকর নাও হতে পারে এটা মনে রাখতে হবে।

২. এসব নতুন কিছু নয়, মূলত বিভিন্নজনের অভিজ্ঞতার আলোকেই আমরা ধারাগুলো তৈরি করেছি।

৩. সব মা-বাবাই সন্তানদের উত্তম শিক্ষা দিতে চান। আদব-সহবত শিক্ষা দিতে চান। সংবিধানের ধারাগুলো তাদের পছন্দ হবে। তবে অল্প কিছু মানুষ আপত্তি তুলে বলেছেন, এমন ধারা দিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ চলতে পারে, বাবা-মায়ের ঘরে এসব থাকা সন্তানদের ওপর নির্যাতনের নামান্তর। ঘরের পরিবেশ গুমোট হয়ে যাবে।

৪. আমরা বলব, আমরা ঘরে এসব ধারা অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ পরিবেশেই বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছি। বাচ্চারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মানছে। তাদের উৎসাহেই মূলত আমরা এটা চালু করতে পেরেছি। ধরে রাখতে পেরেছি। অবশ্য এর আগে তাদের মধ্যে সঠিক বুঝটা তৈরি করতে হয়েছে।

৫. আমাদের সংবিধানের কিছু ধারা, সব ঘরের উপযোগী নাও হতে পারে। সব দেশের জন্যে উপকারী নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে নিজেদের সুবিধামতো বদলে নিলেই হবে। প্রতিটি মাতা-পিতারই জানা আছে, তার সন্তানের জন্যে কোনটা ভালো হবে আর কোনটা মন্দ!

৬. এ ধরনের সংবিধান মূলত ছয় থেকে আঠারো বছর বয়েসী সন্তানদের জন্যে। আমরা আসলে সংবিধানটা ঘরে লটকানোর প্রয়োজন বোধ করতাম না। কিছু বিষয় দেখার পর, আমাদের দুজনের টনক নড়ল।

ক. বাচ্চারা স্কুলে যাওয়া-আসা শুরু করলে, আমরা লক্ষ করে দেখলাম, তাদের আচরণগুলো আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। আমরা বাসায় তাদের যেভাবে গড়েপিটে তুলছি, তারা এর বাইরেও কিছু 'ব্যতিক্রমী' চিন্তা-মূল্যবোধ ঘরে নিয়ে আসছে! যা আমাদের ঘরের সাথে, পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে খাপ খায় না।

খ. যতদিন পর্যন্ত ছেলেরা পাড়ার ছেলেদের সাথে খেলতে যায়নি, ততদিন পর্যন্ত তাদের কথাবার্তা আমাদের চাহিদামাফিকই হয়েছে। পাড়ার ছেলেদের সাথে মেশার পর থেকেই তাদের হাবভাবে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে।

গ. আমরা দুজন ভাবতে বসলাম, কীভাবে বাচ্চাদের আশপাশের কুফল থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায়! আমাদের গৃহ-সংবিধান মূলত এই চিন্তারই ফসল।

* * *

গৃহ-সংবিধান

☛ (এক) সময়মতো সালাত আদায় করব।

☛ (দুই) কথা বলার সময় দুটি শব্দ কিছুতেই ভুলব না :

✍ (ক) মিন ফাদলিক, অনুগ্রহ করে...!

✍ (খ) শুকরান, ধন্যবাদ—জাযাকাল্লাহু খাইরান!

☛ (তিন) কখনো মারামারি করব না। গালাগালি করব না। রুচিগর্হিত কোনো শব্দ উচ্চারণ করব না।

☛ (চার) পরিপূর্ণ আদব ও স্পষ্টতার সাথে নিজের কথা খুলে বলব।

☛ (পাঁচ) যা খুলেছি নিজেই তা বন্ধ করব (দরজা-জানালা-তাক-কৌটা-বাক্স)। যা ফেলে দিয়েছি যথাস্থানে তুলে রাখব, ঘরের প্রতিটি স্থানকে আগের চেয়ে সুন্দর করে রাখব!

☛ (ছয়) আমার কামরার দায়িত্ব আমার। পরিচ্ছন্নতা, বিন্যাস, পরিপাটি।

☛ (সাত) যে-ই কথা বলুক, তাকে না থামিয়ে পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনব।

☛ (আট) ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় সালাম দেব।

☛ (নয়) প্রতিদিন এক পারা করে কুরআন তিলাওয়াত করব।

☛ (দশ) রাত দশটার পর আর জেগে থাকব না।

☛ (এগারো) সব ধরনের গেমস প্রতিদিন এড়িয়ে চলতে সচেষ্ট থাকব। শারীরিক পরিশ্রমমূলক খেলাধুলা করব।

☛ (বারো) আম্মু-আব্বুকে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাব। বাহির থেকে এসে তাদের কপালে চুমু দেব।

☛ (তেরো) রাতের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পড়াশোনা ও বাড়ির কাজ শেষ করব।

☛ (চৌদ্দ) ঘরের সমস্ত আসবাবপত্রের হেফাজতের দায়িত্ব আমাদের সবার।

☛ (পনেরো) আম্মু-আব্বু ছাড়া সবাই নিজের কাজ নিজেই করব। অপরকে আদেশ করব না।

☛ (ষোলো) সবকিছুর ওপর পরিবারকে অগ্রাধিকার দেব। যেকোনো কিছুর আগে পরিবারের প্রয়োজন প্রথমে পূরণ করতে সচেষ্ট থাকব।

☛ (সতেরো) দরজায় টোকা ও অনুমতি ছাড়া একে অপরের কামরায় প্রবেশ করব না।

☛ (আঠারো) কোনো পরিস্থিতিতেই গলার আওয়াজ উঁচু করব না।

☛ (উনিশ) সুস্থতা ও পরিচ্ছন্নতা (দেহ, পোশাক, দাঁত ও নখ) ও শরীরচর্চাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করব।

☛ (বিশ) সবার সাথে উত্তম আচরণ সুন্দর ব্যবহার করব।

জীবন জাগার গল্প : ৬৭৭

বধূয়া

আবির পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। মাস তিনেক আগে নতুন বিয়ে করেছে। তারপর থেকেই তার বোলভাল বদলে যেতে লাগল। বন্ধুরা একদিন বাগে পেয়ে তাকে ধরে বসল, তাদের বদলে যাওয়ার কাহিনি বলতে হবে। আবির তাদের কী বলবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না। আসলে সেও এখনো তার বদলে যাওয়ার বিষয়টা ঠাওর করে উঠতে পারছিল না। বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে আর থাকতে না পেরে শেষে মুখ খুলল।

-কীভাবে পুরো বিষয়টা খুলে বলব গুছিয়ে তুলতে পারছি না।

আবিরের দ্বিধা দেখে আফনান বলল :

-ঠিক আছে, আমরা প্রশ্ন করি। তুই শুধু উত্তর দিয়ে যা। কিছুই লুকোবি না বলে দিলাম।

-আচ্ছা, এখানে লুকোচুরির কী আছে?

-তোর সাথে কি ভাবির বিয়ের আগে থেকেই পরিচয় ছিল?

-নাহ, একদম না।

-তা হলে তোদের পারিবারিক ধ্যানধারণা থেকে এক শ আশি ডিগ্রি বিপরীত মেরুর একটা পরিবারের সাথে কীভাবে যোগাযোগ ঘটল।

* * *

-বলছি শোন! তোরা জানিস, আমার মাউন্টেনিং মানে পাহাড়ে চড়ার বেশ শখ। বাংলাদেশের প্রায় সব পাহাড়েই চড়া শেষ হয়ে গেছে। আগামী বছর নেপালে যাওয়ার কর্মসূচিও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। নেপাল যাওয়ার আগাম প্রস্তুতি হিসেবে আমাদের দলটা কয়েক মাস আগে বান্দরবান গিয়েছিল। আমরা দলে ছয়জন ছিলাম। আমাদের গন্তব্য ছিল চিম্বুক পাহাড়। ট্র্যাকিং (পর্বতারোহণ) শেষ করে বেস ক্যাম্পে ফিরে এসেছি। এমন সময় তিনজন মানুষ সেখানে এলেন। জানালেন, এখানে তাবলীগে এসেছেন। ঢাকা থেকে। আমাদের সাথে কিছু কথা বলতে চান।

সাথে আসা দিপীকা আর পারিতা বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেল। একে তো মেয়ে, তার ওপর ভিন্নধর্মাবলম্বী। তাবলীগে আসা তিনজনের একজন বললেন,

-কোনো সমস্যা নেই। ওনারা একপাশে গিয়ে অপেক্ষা করুক। আমরা সামান্য কয়েকটা কথা বলেই বিদায় নেব।

দিপীকা বলল,

-কোনো সমস্যা নেই। আমরা ক্যাম্পের ভেতরে গিয়ে অপেক্ষা করছি।

একজন তাবলীগি ভাই কথা শুরু করলেন। প্রথমে নিজের পরিচয় দিলেন। এক মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এখন ছুটিতে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছেন। তিনি ইসলামের পরিচয়, আল্লাহ আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন, আখিরাত কী, জান্নাত-জাহান্নাম কী, কুরআন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ অনেক বিষয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই আলোচনা করলেন। বললেন, এখানে আমাদের কাজ শেষ হলে তাদের সাথে যেন কিছুটা সময় কাটাই। তা হলে তারা ভীষণ খুশি হবেন। আমাদের সবাইকে এক বেলা খাবারের দাওয়াতও দিলেন। বোনদেরও বাদ দিলেন না। তাদের খাবার তাঁবুতে পাঠিয়ে দেবেন!

* * *

তাঁরা দাওয়াত দিয়ে চলে গেলেন। আমরা ক্লান্ত ছিলাম। ক্যাম্পে এসেই ঘুমিয়ে পড়লাম। আমাদের গাইড ছিল একজন চাকমা ছেলে। নাম অভিলাষ। সে বাজার করতে গিয়েছিল। পরদিন ছিল আমাদের ঢাকা ফেরার তারিখ। রাতে শুয়ে শুয়ে তাবলীগের কথাগুলো নিয়ে আমি অনেক ভাবলাম। পাশে শোয়া আফনানের সাথেও বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাইলাম। সে হেসেই উড়িয়ে দিল। সকালে উঠে সবাই গোছগাছ করতে লেগে গেল। আমিও সবকিছু গুছিয়ে নিলাম। সবাই রওনা হওয়ার আগ মুহূর্তে আমি বললাম,

-তোরা যা, আমি এখানে কয়েকটা দিন থাকতে চাই।
-এখানে থাকবি মানে?
-মানে আর কিছু না, আমি তাবলীগের হুযুরদের সাথে কিছু সময় কাটাতে চাই। গতকাল তাদের কথা শুনে আমার ভেতরে কিছু কৌতূহল আর প্রশ্ন জেগেছে।
-ঠিক আছে। তোর ওপর তো জোর চলবে না। তুই সব সময় যা ভালো মনে করিস সেটাই করিস। আমরা তা হলে চললাম।

* * *

তখন রমযান মাস ছিল। আমি রোযা রেখে অভ্যস্ত ছিলাম না। তাবলীগের ভাইদের সাথে আমিও রোযা রাখলাম। ইফতারের সময় দারুণ এক অনুভূতি হলো। একদিন থাকতে এসে কীভাবে যেন দশদিন কেটে গেল। অনেক কিছু শিখলাম। জানলাম। দেখলাম। বুঝলাম।

* * *

সেদিন আমাদের যিনি দাওয়াত দিয়েছিলেন, তিনি হলেন মাওলানা আবদুল্লাহ ভাই। তার সাথে এ ক'দিনে বেশ হৃদ্যতা সৃষ্টি হলো। তিনি আমাকে বড় আপন করে নিলেন। শুধু তিনি কেন, জামাতের সবাই আমাকে আপনের চেয়েও বেশি সমাদর করেছেন।
একদিন কথাপ্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ভাইকে বললাম,
-আমি পরিবারের বড় ছেলে। আব্বু-আম্মু চাচ্ছেন আমি যেন শিগগির বিয়ে করি। আমার চাকরি খোঁজার দরকার নেই। আমাদের ব্যবসা দেখাশোনা করা লাগবে। এখন বলুন তো, আমি দ্বীনের ওপর অটল থাকা এবং দ্বীন শেখার জন্য কী করতে পারি?
—একটা দ্বীনদার মেয়ে বিয়ে করুন। তা হলে আপনার দ্বীন শেখা ও দ্বীনের ওপর চলা দুটোই সহজ হয়ে যাবে।
—আমাকে দ্বীনদার মেয়ে কে দেবে! আমার পরিবারই-বা এমন মেয়েকে পুত্রবধূ হিশেবে মেনে নেবেন কেন?
-এটা একটা সমস্যা বটে, তবে সমাধানাতীত নয়।

* * *

আমরা ঢাকা ফিরে এলাম। আম্মু বিয়ের জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করলেন। আবদুল্লাহ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনি বললেন,

-আমার কাছে আপনার চাহিদামতো একটা পাত্রী আছে। কিন্তু সমস্যা হলো, পাত্রীর পিতা মেয়েকে আলিম ছাড়া বিয়ে দেবেন না। তবে চেষ্টা করে দেখতে মন্দ কী!

-মেয়েটার ঠিকানা?

-সত্যি কথা বলতে লজ্জা লাগছে। তবুও আপনার আন্তরিকতা ও আগ্রহ দেখেই শুধু আমি এমন চিন্তা করেছি। মেয়েটা আসলে আমার ছোট বোন। তার নাম আয়েশা। এখন আব্বু-আম্মু আর ছোটবোন যদি রাজি হন, তা হলে আপনি যেমনটা চান সে রকম একটা মেয়ে আপনি পাবেন হয়তো। আমি অনেক খুঁজেছি। কিন্তু আপনার সাথে কাউকে মেলাতে না পেরে শেষে এই সমাধানে এলাম। তবে আপনার হাতে সময় থাকলে আমি আপনার উপযুক্ত পাত্রী খুঁজে বের করে ফেলতে পারব। ইনশা আল্লাহ।

-না না, কী বলছেন আপনি! এ তো আমার কাছে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো।

-আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। আমাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে আব্বুর সাথে দেখা করতে হবে। আব্বু এখন ইতিকাফে আছেন। আমাদের মাদরাসার মসজিদে। প্রতিবছরই বসেন।

* * *

সব গোছগাছ করে আবদুল্লাহ ভাইদের গ্রামের উদ্দেশে রওনা দিলাম। রশিদপুর পৌঁছতে ইফতারির সময় হয়ে গেল। আবদুল্লাহ ভাই বললেন :

-আব্বু এখন কথা বলবেন না। তিনি মাগরিবের পর আউয়াবিন আদায় করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। তারাবির পর তিনি আপনার সাথে কথা বলবেন। অবশ্য তারাবি পড়ে তিনি সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়েন। কারও সাথে কথা বলেন না। তবুও আপনি মেহমান! আপনার জন্যে ব্যতিক্রম করবেন।

* * *

আমার আসার ব্যাপারে তাদের পরিবার আগে থেকেই জানত। তাই তারাবির পর আবদুল্লাহ ভাইয়ের আব্বুর সাথে দেখা করতে কোনো সমস্যা হলো না। আমি আমার অবস্থা পুরোপুরি জানাতে চাইলাম। তিনি বললেন,

-আমি তো বাবা এখন তোমার সাথে বেশি কথা বলতে পারব না। আর এখন কথা বলার সময়ও নয়।

-তা হলে আগামীকাল?

-না, আমি ইতিকাফ থেকে বের হওয়ার আগে নয়। এখানে অতি প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অন্য কিছু বলা ঠিক নয়।

-তা হলে কি বিয়ের কথা স্থগিত থাকবে?

-না, তার প্রয়োজন হবে না। তোমার ব্যাপারে আমি বিস্তারিত শুনেছি। যদ্দূর সম্ভব খোঁজ-খবর করেছি। একবার চোখে দেখার প্রয়োজন ছিল, তাও এখন হলো। আবদুল্লাহর আম্মুর সাথে পরামর্শও করেছি। আবদুল্লাহর পীড়াপীড়িতে আমরা এখানে সম্পর্ক করার ব্যাপারে রাজি হয়েছি। এখন হলো পাত্রী দেখার বিষয়। এটা সুন্নত এবং তোমার অধিকার। সেটার ব্যবস্থা করতে বলে দিয়েছি।

* * *

মসজিদ থেকে ঘরে ফিরে এলাম। ধর্ম সম্পর্কে আমার জানার পরিধি খুবই কম। তবুও গত ক'দিনে যা জেনেছিলাম, একজনের কাছে শুনেছিলাম মা হাফেযা হলে সন্তানদের হাফেয হওয়াটা সহজ হয়। কথাটা শোনার পর থেকেই আমার খুবই আগ্রহ, একজন হাফেযাকে বিয়ে করার। আমি অবদুল্লাহ ভাইয়ের কাছে তার বোনের হেফযের বিষয়টা জানতে চাইতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। তারপরও দ্বিধা সরিয়ে বললাম,

-আপনার বোন কি কুরআন কারীম হিফয করেছেন?

–আরে, কুরআন হিফয করাটাই আসল ব্যাপার নয়! গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিজের জীবনে ইসলামের বাস্তবায়ন করা।

আমি বুঝতে পারলাম না, তার এ কথা শুনে খুশি হব না কি বেজার হব! তিনি সরাসরি উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলেন কেন? বেশিক্ষণ ভাবার সময় পেলাম না।

* * *

আমাকে একটা সুন্দর করে সাজানো কামরায় বসানো হলো। একটু পরে আবদুল্লাহ ভাই তার বোনকে সাথে করে নিয়ে এলেন। আমি উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম। দুজন মুখোমুখি একটা বড় টেবিলে বসলাম। আমি কেন যেন খুবই লজ্জা পাচ্ছিলাম। আমার লজ্জা দেখে আমি নিজেই অবাক। আমি একটা মেয়ের সামনে লজ্জা পাচ্ছি? ওকে মানে আয়েশাকে দেখলাম আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। আবদুল্লাহ ভাই বললেন :

-আপনি লজ্জা পাচ্ছেন কেন। এটা তো লজ্জার সময় নয়। আপনার কিছু জানার থাকলে আয়েশাকে প্রশ্ন করুন।

আমার কিছুই মনে আসছিল না। আজকে পাত্রী দেখা হবে সেটাই তো আমার জানা ছিল না। আর পাত্রী দেখতে গিয়ে একটা মানুষকে ভর্তি-পরীক্ষার মতো নানা প্রশ্নে নাজেহাল করা, যোগ্যতা যাচাই করার জন্য নানারকমের অপমানজনক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যাওয়াটা আমি চরমভাবে ঘৃণা করতাম। মাথাটাকে পুরোপুরি ফাঁকা মনে হলো। সাহস সঞ্চয় করে জানতে চাইলাম :

-আপনি কুরআন কারীম কতটুকু মুখস্থ করেছেন?

-আমার আমপারা মুখস্থ আছে।

-আমি আলিম নই। আমার পরিবারও ধার্মিক পরিবার নয়। এখানে সম্পর্ক করতে আপনার আপত্তি নেই তো!

-আব্বু-আম্মু যেটা ভালো মনে করেন তা-ই হবে!

-আমার সম্পর্কে আপনার যদি কিছু জানার থাকে!

-জি না! ভাইয়ার কাছে শুনেছি!

* * *

আমি আর কোনো কথা খুঁজে পেলাম না। অনুমতি নিয়ে বের হয়ে এলাম। পরদিন ঢাকা ফিরে এলাম। আবদুল্লাহ ভাই বলেছিলেন,

-বিয়ের ব্যাপারে আমাদের চূড়ান্ত মতামতটা ফোনে জানালেই হবে।

আমি বলেছিলাম,

-আমরা দুজন কি একাকী একবার কথা বলতে পারি বা কোথাও একদিন বাইরে ঘুরতে বের হলাম?

-না, এটা শরীয়ত অনুমোদন করে না। আর আয়েশাও এতে রাজি হবে না।

-তা হলে ফোনে তো কথা বলা যাবে?

-না সেটাও প্রয়োজন ছাড়া জায়েয নেই। আপনার আরও কিছু জানার থাকলে আমাকে বলবেন, আমি জানিয়ে দেব। চাইলে আয়েশার সাথে কথাও বলিয়ে দেব।

-আচ্ছা ঠিক আছে। ঢাকা গিয়ে আব্বু-আম্মুকে জানাই। তারপর মুরুব্বিদের কেউ হয়তো আনুষ্ঠানিকভাবে দেখতে আসবেন।

-কেন আপনার কি পাত্রী পছন্দ হয়নি? পাত্রের দেখাটাই তো চূড়ান্ত। তবুও আপনি মুরুব্বিস্থানীয় কাউকে নিয়ে আসতে পারেন। আসার সময় কোন আয়োজন করে আসার দরকার নেই। ওনারা দেখার পর যদি পছন্দ করেন, তা হলে ওই দিনই বিয়ে হয়ে যাবে। আমাদের ইচ্ছা, বিয়ের

আয়োজন আর খরচ যত কম করা ততই ভালো। হাদীসে আছে, যে বিয়েতে খরচ যত কম হবে, সে বিয়ে তত বেশি বরকতময় হবে। আসুন, ঘুমিয়ে পড়ি। ভোররাতে সেহেরি খেতে হবে। আব্বুর সাথে কিয়ামুল লাইল মানে তাহাজ্জুদের জামাতে যোগ দিতে হবে।

-একটা কথা, আমি জানি হুযুরদের বাড়িতে টিভি থাকে না। আপনাদের বাড়িতেও কি এ-জাতীয় কিছু নেই? ঘরের মহিলারা সময় কাটায় কীভাবে?

-না নেই। ভাগ্যিস, আপনি এই প্রশ্ন আয়েশাকে করেননি! ওকে এ ধরনের প্রশ্ন করলে আপনার সঙ্গে বিয়েতে রাজিই হতো না। আমি ওকে বলেছি, আপনি আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাবলীগে গিয়ে খুবই ভালো হয়ে গিয়েছেন। আর সময় কাটানোর কথা বলছেন? সময় কীভাবে যে কাটে সেটা আপনাকে বলে বোঝানো যাবে না। আমাদের ঘরটা বলতে গেলে একটা চব্বিশ ঘণ্টার মাদরাসা। আম্মু-বোন সবাই গ্রামের মহিলাদের পালাক্রমে কিছু না-কিছু তালিম দেয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে। ফাঁকে ফাঁকে সংসারের ঘরকন্নার কাজ চলে।

* * *

বাসায় এসে জানালাম। আব্বু-আম্মু দুজনেই বেঁকে বসলেন। আব্বু তো এক কথায় জানিয়ে দিলেন :

-আমি বাপু, কোথাও যেতে পারব না। এই মেয়ে তোমার জন্যে উপযুক্ত হবে বলেও মনে হচ্ছে না। তোমার চাচাতো বোন নাজিয়াই তোমার জন্য উপযুক্ত। প্রাথমিক কথাবার্তাও তো একপ্রকার হয়েই আছে।

আমি বার বার এখানে বিয়ে করার আগ্রহ দেখালাম। শেষে আব্বু বললেন :

-ঠিক আছে, তোমার আম্মু আর ছোট মামাকে নিয়ে যাও। তবে জেনে রাখো, যারা বিয়ের আগেই খরচ কমানোর ফন্দি-ফিকিরে থাকে তাদের সাথে সম্বন্ধ করা কতটা যৌক্তিক তা নিয়ে আমার সন্দেহ হয়।

আমরা পাত্রী দেখতে এলাম। আয়েশাকে দেখে তাদের বাড়ির অবস্থা দেখে আম্মু খুবই মুগ্ধ। যদিও বললেন :

-এরা একটু বেশিই ধার্মিক। তুই হজম করতে পারবি কি না সেটা তোর ব্যাপার।

ছোট মামা বললেন :

-ভাগ্নে, এদের আন্তরিকতা, আতিথেয়তা সবই ভালো। কিন্তু ব্যাপারটা মনে হচ্ছে কচুপাতা আর পানি।

-মানে?
-মানে আমাদের সাথে মিল হবে কি না বুঝতে পারছি না।
আম্মুর কাছে জানতে চাইলাম,
–কুরআন কারীম হিফযের ব্যাপারে কিছু জানতে চেয়েছিলে?
–ইশশি রে! একদম ভুলে গেছি। কিন্তু তার ছোট বোনকে একটা কথা বলতে শুনেছি। সেটা আমি বুঝতে পারিনি।
-কী কথা?
-নাওরা, রাতে কিন্তু সূরা মায়িদার মুশাবাহার আয়াতগুলো আমার সাথে ধরাধরি করতে হবে। একজন আরেকজনকে পুরো সূরাটা মুখস্থ শোনাব।

* * *

চিন্তায় পড়ে গেলাম। মুশাবাহার আয়াত মানে কী? আর সূরা মায়েদা যদ্দূর জানি আমপারায় নেই। শুরুর দিকে আছে বোধহয়। কিন্তু আমাকে বলেছে, সে আমপারা মুখস্থ করেছে। তা হলে কি আম্মুকে দেখানোর জন্যে এ কথা বলেছে? কী জানি! এ ধরনের লোক দেখানো ব্যাপার তাদের মধ্যে থাকার কথা নয়।
আরও কয়েকটা বিষয়ে আমার মনে খটকা সৃষ্টি হলো, আবদুল্লাহ ভাইয়ের আব্বু ছোট মামাকে বলে দিয়েছেন,
–আপনারা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে জানাবেন। আমরা কাজটা ফেলে রাখতে চাচ্ছি না। আর বার বার দেখাশোনাও আমাদের পছন্দ নয়। আমরা বলেছিলাম পরের বার আসলে, যদি পছন্দ হয় তা হলে আকদটা হয়ে যাবে। কিন্তু আপনারা বলছেন পরে জানাবেন। আমরা বলেছিলাম, আমাদের এখানে কোনো আয়োজন হবে না। বড় ধরনের খাবার-দাবারের অয়োজনও হবে না। কিন্তু আপনারা বলছেন, অনেক মেহমান নিয়ে আসবেন। এই বিষয়গুলো আপনারা আগে ঠিক করুন।

* * *

ঢাকায় ফিরে আম্মুকে জিজ্ঞেস করলাম,
-তাদের এত তাড়াহুড়ো করার কারণ কী?
-তোর আব্বুকে জিজ্ঞেস কর।
আব্বু এমনিতেই এখানে সম্বন্ধ করার প্রতি আগ্রহ দেখাননি। শুধু আমার আগ্রহ আর আম্মুর উচ্ছ্বাস দেখেই চুপচাপ আছেন। তার কাছে আমার খটকাগুলোর কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন,

-আরে, আমি আগেই বলেছিলাম। ভেতরে কোনো ঘাপলা আছে। না হলে এত তাড়াহুড়ো কিসের?

-আমার মনে হয়, ভালো কাজে দেরি করতে নেই। এ জন্যেই তারা কাজটা দ্রুত সেরে ফেলতে চাচ্ছেন। আবদুল্লাহ ভাইয়ের আব্বা বলেছেনই, বিয়ের কথাবার্তা শুরু হওয়ার পর দেরি করা ঠিক নয়।

-আমি এত তাড়াহুড়োর মধ্যে ভালো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

-কিন্তু আমি তাদের মধ্যে সরাসরি খারাপ কিছু দেখিনি। তারা খুবই ধার্মিক। এসব আচরণ বোধহয় তাদের ভালোভাবে ধর্মপালনেরই একটা অংশ।

-ধর্মপালন মানে কি হাসি-আনন্দ থেকেই বঞ্চিত করা? কী জানি বাপু, এখন তো নবীর যুগ নেই! আর যুগের দাবি বলেও তো একটা কথা আছে।

***

আমি আব্বুর সাথে আর কথা বাড়ালাম না। ধরে নিলাম এসব কিছু তাদের ধার্মিকতার অংশ। আম্মুর আগ্রহে বিয়ের কথাবার্তা প্রায় পাকা হয়ে গেল। কয়েক দিন পর বিয়েও হয়ে গেল।

আমাদের দুজনের দ্বিতীয় বার দেখা হলো বাসর রাতে। দীর্ঘ পথের ক্লান্তিতে আয়েশা খুবই ক্লান্ত ছিল। কামরায় প্রবেশ করে সালাম দিলাম। সে সালামের উত্তর দিল। দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলাম। সে কিছুক্ষণ পর বলল,

-আমার কপালের চুলে হাত রেখে এই দু'আটা পড়ুন।

সে আমাকে একটা দু'আ শিখিয়ে দিল। আমিও তার মুখে মুখে দু'আটি পড়লাম। এর পরই আমার আর তর সইছিল না, তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

-আচ্ছা, বলো তো আয়েশা! তুমি কুরআন কারীম কতটুকু মুখস্থ করেছ?

-আলহামদু লিল্লাহ! পুরোটা।

-কিন্তু তুমি তো বলেছিলে, শুধু আমপারাটাই তোমার মুখস্থ আছে।

-মিথ্যা বলিনি। সেদিন আমার ত্রিশ পারা শোনানোর দিন ছিল। সেজন্যে পারাটা আমি ভালোভাবে মুখস্থ করেছিলাম। আর নিজেকে আগে বেড়ে হাফেযা বলে পরিচয় দিতে আমার ভালো লাগে না। আজকের রাতটা তো রাগ করার রাত নয়। আমার কথায় রাগ হলে ক্ষমা চাইছি। আসুন, আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেন :

'আর তোমরা অন্বেষণ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে রেখেছেন' -সূরা বাকারা। (০২ : ১৮৭)

* * *

এভাবে হাসি-আনন্দে আমাদের বিয়ের প্রথম মাস কেটে গেছে। আয়েশা এই একটা মাস আমার জন্যে তার সবকিছু কুরবান করে দিয়েছিল।

আমি জেনেছিলাম, তাদের বাড়িতে সবাই তাহাজ্জুদ নামায পড়ে। নিয়মিত দীর্ঘ সময় কুরআন তিলাওয়াত করে। নফল নামায পড়ে। কিন্তু এই এক মাসে তাকে এসবের কিছুই করতে দেখিনি।

সে সারাক্ষণই কিসে আমি খুশি হবো, কী করলে আমার ভালো লাগবে, কোন শাড়িটা পড়লে তাকে বেশি সুন্দর লাগবে, সেলোয়ার কামিজের কোন সেটটা আমার পছন্দ, চুল কীভাবে বাঁধলে আমি খুশি হব, এ নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

আমাকে প্রায় জেরা করে করে জেনে নিল আমি কী পছন্দ করি, কোন খাবারটা আমার বেশি প্রিয়, কোন পোশাক আমি বেশি পরতে ভালোবাসি, কোন রং আমার পছন্দ, কোন সুবাসটা আমার ভালো লাগে, আমার প্রিয় মানুষ কারা? আমার জীবনের যাবতীয় ভালো লাগা আর পছন্দের বিষয়গুলো সে খুটে খুটে জেনে নিল।

* * *

অবাক হতাম, কঠিন পর্দার মধ্যে থেকেও সে কীভাবে এত সুন্দর করে সাজতে শিখল! আর এত সুন্দর আচরণই বা কীভাবে শিখল? রসকষহীন ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেও সে কীভাবে এমন রুচিশীল হলো? বয়েস কত অল্প, কিন্তু আচার-আচরণ কী পরিণত!

* * *

সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, আয়েশা আমাদের ঘরটাকে ঠিক আমার থেকে সংগ্রহ করা তথ্যানুসারেই সাজাল। ঘরের পর্দার রং বদলে গেল। খাবার রান্নার ধরন না বদলালেও স্বাদ বদলে গেল।

যে আব্বু তার কথা শুনতেই চাইতেন না তাকে পর্যন্ত সে কীভাবে যেন পোষ মানিয়ে ফেলল। আম্মু তো তাকে আগেই পছন্দ করে ফেলেছিলেন। আম্মুর কোনো মেয়ে না থাকায় ব্যাপারটা আরও সহজ হয়ে গিয়েছিল।

* * *

এক মাস পরে আমি আবার অফিসে যেতে শুরু করে দিলাম। এই এক মাসে সে একবারও বাবার বাড়ি যাওয়ার কথা বলেনি। এমনিতেই ফোনে সব সময় মায়ের সাথে কথা বলত। একবার আমাদের অফিসের কাজে আমাকে চট্টগ্রাম যেতে হলো। দশ-পনেরো দিন থাকতে হবে। বিদায় নিয়ে চলে এলাম কাফকোতে। কর্ণফুলী সার কারখানায়। এখানে একটা ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণ করার জন্যে।

* * *

চট্টগ্রামের কাজ শেষ হলে চুপিচুপি ঢাকা ফিরে এলাম। আব্বু-আম্মু বাসায় নেই। সিলেটে গিয়েছেন। বাসায় শুধু কাজের বুয়া আর আয়েশা। আবদুল্লাহ ভাইও মাঝেমধ্যে এসে দেখা করে গেছেন।

বাসায় পৌছতে অনেক রাত হয়ে গেল। বাসার কারও ঘুম না ভাঙানোর জন্য, আমি কলিং বেল না বাজিয়ে চুপিচুপি চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করলাম। পুরো ঘরটা নীরব। একেবারে ভেতরে চলে গেলাম। দরজাটা আবজানো। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। ভেতরের দৃশ্যটা দেখে আমার চোখে পানি এসে গেল। আয়েশা জায়নামাযে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর কী একটা দু'আ পড়ছে। বার বার পড়ছে।

সে কীভাবে যেন টের পেয়ে গেল, কামরায় কেউ প্রবেশ করেছে। তাড়াতাড়ি নামায শেষ করল। সালাম ফিরিয়ে আমাকে দেখে যেন সে আকাশের চাঁদ হাতে পেল। আমার হাতটা এমনভাবে চেপে ধরল, যেন আমি কোথাও পালিয়ে যাচ্ছি। বাকি রাতটা আমরা কথা বলেই কাটিয়ে দিলাম। রাতও প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। সে অনুযোগ করে বলল,

-আপনি আসবেন আমাকে আগে জানাননি কেন?

-তোমাকে চমকে দেয়ার জন্য এমনটা করেছি।

-কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

-'তোমাদের কেউ সফর থেকে ফিরে এলে সে যেন রাতের বেলায় দরজায় টোকা না দেয়। যাতে করে স্ত্রীরা প্রয়োজনীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নিতে পারে।'

-আচ্ছা! ভুল হয়ে গেছে। তুমি এমন করে কেঁদে কেঁদে দু'আ করছিলে কেন? কোনো সমস্যা হয়েছে?

-না, সমস্যা হবে কেন? আর আল্লাহর কাছে কি শুধু সমস্যা হলেই দু'আ করতে হয়? সব সময় দু'আ করাই তো বান্দার কাজ।

–কই তোমাকে তো বিয়ের পর এক মাস কোনো অতিরিক্ত নামায-কালাম করতে দেখিনি।

-আমি নামায-কালাম করি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে। আপনি কাছে থাকলে আপনার সন্তুষ্টি, আপনার খেদমতই আমার জন্য আল্লাহর রেজামন্দি হাসিলের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

-আয়েশা!

-বলুন!

-আমার একটা বিষয় খুবই অবাক লেগেছে। তুমি কিন্তু এই পর্যন্ত একবারও তোমার বাড়িতে যাওয়ার কথা বলোনি। তোমার আগের কথা মনে পড়ে না? মা-কে দেখতে ইচ্ছে করে না?

-খুব ইচ্ছে করে। সব সময় ইচ্ছে করে। কিন্তু বিয়ের পর স্বামীর ঘরই স্ত্রীর নিজের ঘর। আর বিয়ের পর আপনিই আমার মুরুব্বি। আমার সবকিছুর দায়-দায়িত্ব আপনার ওপর। আমার কখন বাপের বাড়ি যাওয়া দরকার সেটা আপনিই ভালো বুঝবেন। আমি শুধু শুধু কেন আগে বেড়ে আপনাকে বিব্রত করতে যাব?

* * *

আবির গল্প শেষ করে বলল,

-এবার তোরাই বল, এমন একটা ফিরিশতার পাশে থেকে আমি কী করে আগের মতো দুষ্ট থাকি? কীভাবে রাত জেগে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিই? কীভাবে আগের মতো বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াই? বেগানা নারীদের সাথে নিয়ে পাহাড় ডিঙাতে বের হই? এমন একটা মানুষের জন্য সবকিছু উজাড় করে দিতে মন চায় কি না তোরাই বল।

জীবন জাগার গল্প : ৬৭৮

বাড়ির কাজ

প্রতিষ্ঠানটা ব্যতিক্রমী। ভর্তির আগেই জানিয়ে দেয়া হয় :

✍ আমরা মাদরাসায় আপনার সন্তানকে পড়াব। কিন্তু আমরা চাই, সে তার আগে ঘর থেকেই কিছু পড়ে আসুক।

✍ আমরা আপনার সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের আশ্বাস দিতে পারি, তার আগে আপনাকেও কিছু আশ্বাস আমাদের দিতে হবে। আমরা কিছু কাজ দেব, সেগুলো বাড়িতে চর্চা করা জরুরি।

✍ মনে রাখবেন, আমরা আপনার সন্তানের অর্ধেক নিয়ে কাজ করব। বাকি অর্ধেকের দায়িত্ব আপনাদের।

✍ আমাদের কথাগুলো মেনে চলতে পারলে, সংসারও সুখের হবে। সন্তান নিয়েও সুখী হওয়া যাবে। আমরাও পারব আপনার সন্তানকে মানুষরূপে গড়ে তুলতে।

* * *

(এক) প্রতিদিন বাড়ির কাজ শুরু হবে ফজরের নামায দিয়ে। তাহাজ্জুদ দিয়ে হলে আরও ভালো। ঘরের পবিবেশটাই যেন এমন হয়, সবাই ফজরের পর, সকালবেলার মাসনুন আমলগুলো করতে শুরু করে। একটা ঘরে সকাল-সন্ধ্যা হাদীসে বর্ণিত মাসনুন আমলের পরিবেশ থাকলে সে ঘরের সন্তান কিছুতেই বখে যেতে পারে না।

(দুই) বাড়িতে সব সময় ইস্তিগফারের পরিবেশ জারি রাখার চেষ্টা করা। উঠতে-বসতে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে। গুনাহ্ মাফ হবে। রিযিক বৃদ্ধি পাবে। ঘরে বরকত আসবে।

(তিন) বিভিন্ন উপলক্ষে দু'আ করার অভ্যেস গড়ে তোলা। ঘরের ছোটখাট প্রয়োজনের জন্যে প্রথমে দু'আ তারপর চেষ্টা করার অভ্যেস গড়ে তোলা। দু'আই মুক্তির পথ। সমাধানের সূত্র। সন্তান যেন প্রতিটি চাহিদা আব্বু-আম্মুকে জানানোর আগে আল্লাহকে জানাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

(চার) প্রতিটি কথা ও কাজ ফিরিশতারা লিখে রাখছেন। আল্লাহ দেখছেন। সবার মধ্যে এ অনুভূতি জাগরূক থাকা। ঘরের দেয়ালে দেয়ালে কথাটা লাগিয়ে রাখা।

(পাঁচ) যত কঠিন পরিস্থিতিই হোক, ঘরে যেন আল্লাহ্র রহমতের প্রতি আশাবাদী থাকার মানসিকতা বিরাজমান করে। ঘরে চাল ভেঙে মাটির সাথে মিশে গেলেও সন্তানদের হতাশা প্রকাশ করতে না দেয়া। ভেঙে পড়ার সবক না দেয়া। তাদের সামনে নেয়ামতের কথা বলতে থাকা।

(ছয়) প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েই আল্লাহর ইবাদত করা যায়। আঙুল দিয়ে তাসবীহ্ গোনা যায়। যিকির গোনা যায়। কোন অঙ্গ দিয়ে কী কী ইবাদত করা যেতে পারে সন্তানদের তা ভাবতে দেয়া। মাঝেমধ্যে তাদের প্রশ্ন করা।

(সাত) বিপদাপদ বেড়ে গেলে, দুঃখ-শোক আসতে থাকলে মুখে মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে থাকা। ছোটদেরও পড়তে বলা। ঘরে খাবার না থাকলেও তাদের বলা, তোমরা যিকির করতে থাকো। খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

(আট) দান-খয়রাতের মাধ্যমে ফকির-মিসকিনদের দু'আ কিনতে উদ্বুদ্ধ করা। গরীব-দুঃখীদের ভালোবাসা অর্জন করার প্রতি উৎসাহী করে তোলা। আখেরাতে জাহান্নামীরা কামনা করবে : ইশ! আমি যদি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে পারতাম, তা হলে বেশি বেশি (فَأَصَّدَّقَ) সদকা করতাম! সদকা অনেক বড় এক ইবাদত।

(নয়) আল্লাহর দরবারে সিজদা দেয়া পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের চেয়ে উত্তম। কথাটা বার বার তাদের কানে ফেলা। বাস্তবে সবাই মিলে কাজে পরিণত করে দেখানো।

(দশ) প্রতিটি কথা বলার আগে ভেবে নেয়ার অভ্যেস গড়ে তোলা। আমি যা বলতে যাচ্ছি, সেটা দুনিয়া বা আখেরাতের কোনো কাজে লাগবে তো?

(এগারো) দুষ্টুমি করতে গিয়ে, খেলতে গিয়ে কারও প্রতি অন্যায় আচরণ হয়ে যাচ্ছে কি না সেটার প্রতি সচেতন থাকা। তার মনে গেঁথে দেয়া : মাজলুমের দু'আ আর আল্লাহর মাঝে কোনো অন্তরাল নেই। বঞ্চিতের চোখের পানি অত্যন্ত বিপজ্জনক। সাবধান! এ থেকে বেঁচে থাকা ভীষণ জরুরি।

(বারো) যেকোনো কিছু পড়ার আগে, সামান্য হলেও কুরআন কারীম পড়ে নেয়া। একটা আয়াত হলেও। নিজেরাই করে দেখাতে হবে। তা হলে শিশুরা দেখে দেখে শিখবে।

(তেরো) ইবাদতে, কাজেকর্মে, কথাবার্তায় ইস্তিকামাত (অবিচল) থাকলে, ছোটরাও দেখবে এবং শিখবে। পরিবারের কর্তাব্যক্তিই পারেন এ আদর্শ স্থাপন করতে।

(চৌদ্দ) মন সব সময় চাইবে মন্দটা বেছে নিতে। কারণ, কুরআনেই আছে (إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ)। নিশ্চয় নফস মন্দ কাজের আদেশদানে অধিক তৎপর। এ জন্যে মনকে ভালোর দিকে জোর করে টেনে রাখতে হবে।

(পনেরো) নিজের বাবা-মায়ের কপালে, হাতে চুমু খেতে হবে। শিশুরাও দেখে দেখে শিখবে। বাবা-মা না থাকলে এমনিতে মুখে বলে বলে শিশুদের অভ্যস্ত করে তোলা। এতে বড় হলে দু-পক্ষের দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা কমে আসবে।

(ষোলো) আমার পুরোনো জামাও গরিবের কাছে নতুন জামার মতো। ধুয়েমুছে সাফসুতরো করেই তার হাতে তুলে দেব।

(সতেরো) রাগী নয়, আদুরে বাবা-মা হয়ে থাকা। প্রয়োজনে রাগও করতে হবে। তবে সেটা হতে হবে যুক্তিসংগত মাত্রায়। পাছে সন্তান আমাকে জালিম ভেবে না বসে।

(আঠারো) আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। নিজেও তাদের বাড়িতে যাওয়া। সন্তানকেও সাথে নিয়ে যাওয়া। এর গুরুত্বও তাকে গল্পচ্ছলে বলা। আল্লাহই এ সম্পর্কের বন্ধন জুড়তে বলেছেন। আদেশ করেছেন।

(উনিশ) আমার সাথে সবচেয়ে শক্তিমান সত্তা আছেন। সবচেয়ে ধনী স্রষ্টা আছে। আমার চিন্তা কী! একমাত্র তারই ওপর আমি ভরসা করি। আস্থা রাখি। একথাটা ছোটরা যেন মাথায়-কথায় এঁকে ফেলে।

(বিশ) গুনাহ করলে, দু'আ কবুলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। গুনাহ সামনে এলেই চিন্তাটা মাথায় আনার চর্চা করিয়ে দেয়া।

(একুশ) সালাতই আমার বিপদাপদে শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। একথা কুরআনেই আছে। আয়াতটাও তাকে মুখস্থ করিয়ে দেয়া। অর্থসহ।

(বাইশ) চট করে কারও সম্পর্কে মন্দ ধারণা করে বসব না। এটা গুনাহ। কুরআন কারীমে নিষেধ করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই করা ছাড়া কোনো মন্তব্য করব না। যা-ই শুনি, প্রথমেই কুরআন তারপর হাদীসকে জিজ্ঞেস করার মানসিকতা গড়ে দিতে পারলে, ভালো হয়। এতে নিজেও সুখে থাকা যাবে। অন্যরাও সুখী হবে।

(তেইশ) আমাকে দুশ্চিন্তা পেয়ে বসেছে? তার মানে আমি কোনো ব্যাপারে আল্লাহবিমুখ হয়ে গেছি। আবার আল্লাহর দিকে রুজু করি। দুশ্চিন্তা কেটে যাবে।

(চব্বিশ) সালাত আদায় শুধু দায়িত্বপালনের জন্যেই নয়। সালাত হলো আল্লাহর সাথে কথোপকথন। সালাত আদায়ের সময় মাথায় রাখতে হবে, এই সালাত যেন আমার সাথে কবরে যেতে পারে। যাচ্ছেতাইভাবে সালাত আদায় করলে, সেটা আমার সাথে কবরে যাবে না।

(পঁচিশ) পরনিন্দা-গীবত মারাত্মক গুনাহ। পরিবারে এই ঘৃণিত কাজের চর্চা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে। কাউকে গীবত করতে দেখলেই বলে উঠতে হবে : ইত্তাকিল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করুন। ছোটবেলা থেকে অভ্যেস গড়ে উঠলে, বড় হলে কারও মুখের ওপর বলে দিতে লজ্জা পাবে না।

(ছাব্বিশ) নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত তো চলবেই, পাশাপাশি সূরা মুলকও ঘরে বিশেষভাবে তিলাওয়াত করা। এ সূরা হলো মুনজিয়া। নাজাতদাতা।

(সাতাশ) খুশু-খুযু, মানে গভীর মনোযোগের সাথে সালাত আদায় করতে না পারাটা বড় এক ব্যর্থতা। অশ্রুসজল চোখে সালাত আদায় করতে পারা বড় এক প্রাপ্তি।

(আটাশ) আমার ভালোবাসার অগ্রভাগে থাকবেন আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল। বার বার বলে কথাটা কচিমনে গেঁথে দেয়া।

(উনত্রিশ) মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা। কেউ দুর্ব্যবহার করলে, তাকে ক্ষমা করতে শেখা। কেউ নিন্দামন্দ করলে, এড়িয়ে যাওয়া। মাফ করে দেয়া। সে আমার গীবত করে মূলত তার পুণ্যগুলো আমাকে দিয়ে দিল।

(ত্রিশ) জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের কথা কল্পনা করা। মাঝেমধ্যে সন্তানকে আগুনের সামনে নিয়ে হাতেকলমে দেখিয়ে দেয়া। গুনাহ করলে পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে।

(একত্রিশ) এক জিলদ কুরআন কারীম সব সময় মাথার কাছে, হাতের নাগালে রেখে দেয়া। যখন-তখন পড়ার সুবিধার্থে। নিজে পড়ার পাশাপাশি ছোটদের পড়তে বসানো। সব সময় এক রুটিনেই কুরআন নিয়ে বসার পাশাপাশি, রুটিনের বাইরেও কুরআন নিয়ে বসা। কুরআনের সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে দেয়া।

(বত্রিশ) পার্থিব জীবন আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া সুন্দর এক নেয়ামত। সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো ঈমানদার হতে পারা।

* * *

✍ আপনারা যদি প্রতিটি ঘরে ঘরে এসব অভ্যেস গড়ে দিতে পারেন, আপনার সন্তানকে ভালো করে দিতে, যোগ্য করে তুলতে আমাদের বেশি বেগ পেতে হবে না।

✍ আপনি কখনো আমাদের কাছে ছেলে-মেয়ে সম্পর্কে অভিযোগ নিয়ে আসার আগে ভেবে দেখবেন, আমাদের দেয়া কাজগুলো আপনি যথাযথভাবে পালন করেছেন কি না। পালন করলে আমাদের কাছে অভিযোগ নিয়ে আসার প্রয়োজনই পড়বে না।

জীবন জাগার গল্প : ৬৭৯

পড়ুয়া মেয়েটিকে বধূয়া করো

(এক)

আমরা তিনজন বসে আছি। নৌকার অপেক্ষায়। বড় ইঞ্জিন-নৌকা। নাফ নদীর তীরে। টেকনাফে। ঘন নীল পানির ধারে। অদূরে কালো কালো ছায়া হয়ে দেখা দেয়া আরাকানের দিকে তাকিয়ে। মনটা উদাস ছিল। তিনজনই আপনমনে কিছু একটা নিয়ে ভাবছিলাম। চারপাশের কোলাহল কানে এলেও মন পর্যন্ত আসছিল না। টুকটাক কথা হচ্ছে। পাশেই এক নব দম্পতি বসে আছে। একেবারেই নতুন। কড়কড়ে টাঁকশালী আনকোরা। সারাক্ষণই গুজুর-গুজুর করছে। গুটুর-গুটুর গল্প করছে। এ ওর গায়ে চিমটি কাটছে। সলজ্জ হাসছে।

দূর থেকে আমাদের নেয়ার জন্যে নৌকা আসতে দেখা গেল। নৌকার মাঝিকে দেখে হঠাৎ কী যে হলো, আমরা তিনজন প্রায় একসাথেই আওড়ে উঠলাম :

O Captain! my Captain! our fearful trip is done,
The ship has weather'd every rack, the prize we sought is won,
The port is near, the bells I hear, the people all exulting,
While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring;

ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতাটা আমাদের বিশেষ কারণে পড়া ছিল। প্রথম কয়েকটা লাইন মুখে মুখে থাকত। আমাদের হেঁড়ে গলার ময়ূর ও বায়সকণ্ঠী বাঙলিশ ইংলিশ 'পোয়েত্রি'(!) শুনে 'বিভোর দম্পতি' ধড়মড় করে ফিরে তাকাল। আমরাও কিছুটা বিব্রত। তারাও অনেকটা 'আশাহত'। ছেলেটা অবরে সবরে আমাদের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি দিতে তাকাল। বুঝতে পারলাম 'হুইটম্যান' তাকে আকৃষ্ট করেছে। কোন ভূমিকা-ভণিতা ছাড়াই সরল ভঙ্গিতে জানতে চাইল :

-পুরো কবিতাটা পারেন?

-নাহ! প্রথম কয়েকটা লাইনই সম্বল! বাকিটা মনে থাকে না!

-কবিতাটা আপনাদের মুখে শুনে ভীষণ চমকে গেছি! কারণ, একটা অপ্রত্যাশিত মুখেই প্রথম কবিতাটা শুনেছিলাম। ঠিক যেমনটা এখানে, আপনাদের মুখ থেকেও অপ্রত্যাশিতভাবেই শুনলাম!

* * *

আমাদের কথা আর বেশিদূর এগুলো না। তরি এসে কূলে ভিড়ল। সবাই জায়গা দখল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বৃষ্টি হওয়াতে সাগর উত্তাল। মাঝিরা এহেন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সেন্ট মার্টিনের দিকে যেতে সাহস করছে না। সবেধন নীলমণি একজন মাঝি যেতে রাজি হয়েছে। দয়া করে। চড়াভাড়ায়। তাই সই। উপায় নেই। যেতে হবে। গরজ বড় বালাই।

* * *

যা আশঙ্কা করা হয়েছিল ঠিক তা-ই। মাঝ সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠল। আমরা তিন বন্ধু একসাথে। নবদম্পতি বসেছিল অদূরে। বিপরীতমুখী হয়ে। নৌকায় ওঠা অবধি দুজন গুনগুন করে সমানে গান গেয়েই যাচ্ছিল। একসাথে। দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল, নবপরিণত হলেও, নবপরিচিত নয় মোটেও। নইলে বিয়ের মেহেদী না শুকোতেই এমন গাঁটছড়া-বাঁধা বোঝাপড়া! উঁহু! ঠিক মেলে না।

ভীষণ কৌতূহলে ফেটে পড়ছিলাম আমরা ত্রিরত্ন! কোন সুর তাহাদের মনে গুঞ্জরিত হচ্ছে! সেটার উপায় নেই! সাগরের দুষ্ট নোনা বাতাসই সব সুর ছেঁকে নিয়ে যাচ্ছে। কান পাতব সে উপায় নেই! তারা দুজনও-বা কেমন! একটু এদিকে ফিরে গাইলে কী এমন অশুদ্ধ হয়! দুটিতে কী আপন আর মনোরম হয়ে ঘেঁষে বসে আছে! পুরো সাগরপথেই ভয়ানক সব ঘটনা ঘটল। জান হাতে নিয়ে কোনোমতে নারিকেল জিঞ্জিরায় পৌঁছা গেল।

* * *

অক্সিজেন। ভ্রমণপিয়াসীর ঢল নেই। গমগমে আনাগোনা নেই। বর্ষাকালে ভয়ে কেউ এদিকটা পা মাড়াতে চায় না বড় একটা। আমরা তাই বেছে বেছে 'বারিশ' মৌসুমেই আসি। টাকাও কম আবার ফাঁকাও বেশি। চারদিক প্রায়ান্ধকার! হাতড়ে হাতড়ে একটা হোটেল বের করা গেল। সব ঠিকঠাক করে ফুল-হুজুরটি হয়ে তিনজনে প্রথম অভিসারে বের হচ্ছি! আবার সেই 'শিরি-ফরহাদ'। আমাদের মতোই বিভিন্ন হোটেলের দ্বারে ঠোকর খেয়ে খেয়ে, এখানে আসতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের দেখে বরটির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

* * *

সাগরপাড়ে, বালুকাবেলাতে নোঙর ফেলে বসে রইলাম। মাগরিব হলো। ইশা হলো আকাশের অগুনতি তারা গুনতে গুনতে। এবার পেটের ধান্দা!

মধ্যপ্রদেশের বিলি-ব্যবস্থা করে আবার সমুদ্রসঙ্গমে আসব, এই অভিপ্রায়ে হোটেলের সুলুকসন্ধানে নেমে পড়া গেল। খেয়েদেয়ে ভিন্ন পথ ধরে সাগরে গেলাম। বিকেলে বৃষ্টি থাকলেও এখন বড় মিঠা হাওয়া দিচ্ছে! আবার সেই দম্পতি! অদূরে চাঁদের আলোয় গলায় হাত দিয়ে হাঁটছে! বেশ আওয়াজ করে রবীন্দ্রসংগীত গাইছে! দুজনেরই এক সুর! এক লয়। বুঝতে বাকি রইল না, তারা পুরান 'দাগী'। বিয়ে করে নতুন 'দাগ' লাগাতে এসেছে!

* * *

দ্বিতীয় দিন আমরা বেশ ব্যস্ত সময় কাটালাম। সমুদ্রস্নান, জলকেলি, নৌকাবাইচ কোনোটাই বাদ পড়ল না। অন্য দিকে মনোযোগ দেয়ার ফুরসত কই! আসরের পর পুরোদস্তুর ফিটফাট হয়ে আবার বেরিয়ে পড়া গেল। একজন ইশারায় দেখাল, একটা নারিকেল গাছের গুঁড়িতে দুজন বসে আছে। ভুল বললাম, বধূয়া বসে আছেন, বাবাজীবন কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। হাতে একটা বই। দূর থেকে নামটা বোঝা গেল না। পরে রাতে হোটেলের লবিতে দেখেছি। বিখ্যাত এক কবির 'নির্বাচিত প্রেমের কবিতা'। হাত নেড়ে নেড়ে আবৃত্তি করছে। আরেকজন মিটিমিটি হাসছে। এমন খোলা জায়গায় এসব করলে, চোখ না দিতে চাইলেও অজান্তে চোখ চলে যায়।

* * *

আমরা নিয়ে গিয়েছিলাম, 'নির্দিষ্ট এক কবির' নির্বাচিত কবিতা। কবিতা তো সাগরতীরে বসে পড়ার 'বস্তু'। মধুচন্দ্রিমা যুগলকে দেখে দেখে আমাদের তিনজনেরই মনে হলো :

-ধ্যাত! কবিতা কি এভাবে 'একা' 'একা' পড়ার জিনিস! তারপরও 'কেউ কথা রাখেনি' বলে বলে, বুকভরা দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছি আর উদাস চোখে তিনজনে বসে বসে ঘাস ছিঁড়েছি! ভাবটা এমন! ঠিক আছে আমরাও পারি! শুধু বিয়েটা করে নিই! তারপর!!! সাগরতীরে কবিতা পড়া কত প্রকার ও কী কী, সব বুঝিয়ে দেব। হুঁ হুঁ! তাই বলে যাকে তাকে বিয়ে করলেই হবে? সবাই কবিতার সমঝদার হবে? ভারি মুশকিলে পড়া গেল? তিনজনে সেন্টমার্টিনের মায়াবী জোছনায় বসে বসেই একটা তালিকা দাঁড় করানো গেল :

-কেমন বউ চাই?

* * *

(দুই)

একটি ইংরেজি লেখা চোখে পড়েছিল। বেশ আগে। সেটার দু-তিনটা বাংলা অনুবাদও বোধহয় ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। আমাদের জন্যে লেখাটার কিছু বক্তব্য অনেকাংশেই হজমযোগ্য নয়। এই ফাঁকে সেটাকে নিজের মতো করে জাবর কেটে ফেলা যাক। সেই হানিমুন-কাপল দেখে আমাদের তিনজনের বুকটাই কেমন যেন টাটাচ্ছিল! ইশ, ইশ, কবে যে হবে! এবার কেমন হবে সেটা খুলে বলা যাক! কিছুটা নকল করে বলছি, কিছুটা নিজ থেকে।

* * *

বিয়ে করো সেই মেয়েটিকে, যার জীবনের প্রথম প্রেম ছিল বই। যে মেয়ে দামি জামা-জুতো না কিনে টাকা বাঁচিয়ে বই কিনে ঘর ভরিয়ে ফেলে। যার আলমারিতে বই রাখতে রাখতে কাপড় রাখার আর জায়গা হয় না। যার মাথায় সব সময় ইপ্সিত বইয়ের একটা তালিকা থাকে, সে তালিকা ক্রমশ বড় হতে থাকে। যে ছোট বয়েস থেকেই লাইব্রেরির সাথে যুক্ত। বইপ্রেমীদের প্রতি অনুরক্ত।

* * *

বিয়ে করো এমন এক মেয়েকে, কুরআন ছিল যার প্রথম পাঠ্যবই। আলিফ-বা-তা ছিল তার প্রথম অস্ফুট বোল। কুরআন তিলাওয়াত ছিল যার প্রথম প্রেম। পর্দাপুশিদা মেনে চলা ছিল যার আজীবন-প্রেম। কুরআন নিয়ে বেঁচে থাকা যার জীবনস্বপ্ন। প্রতিভোরে তোমার শিয়রে বসে বসে যে মিহি সুরে কুরআন তিলাওয়াত করবে। যার কোলে মাথা কুরআন তিলাওয়াতের মায়াকাড়া সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বে। গভীর রাতে তাহাজ্জুদে যার কান্নাভেজা তিলাওয়াত তোমার ঘুম ঘুম চোখ খুলে দেবে। ছুটির দিনে ঘুঘুডাকা নির্জন দুপুরে যে তোমাকে কুরআন পড়ে শোনাবে! তার আঙুলগুলো তোমার মাথায় বিলি কেটে কেটে খেলা করে বেড়াবে! তুমি দুনিয়াতেই জান্নাতী সুখে বিভোর হয়ে পড়বে!

* * *

এমন একটা মেয়ে খুঁজে বের করো, যে আসলেই পড়তে ভালোবাসে। সাধারণ বইয়ের পাশাপাশি দ্বীনী বই পড়ার প্রতিও ব্যাপক আগ্রহ বোধ করে। তুমি তাকে দেখলেই চিনতে পারবে। তার ব্যাগে বা হাতে সব সময় একটা আধপড়া বই থাকেই। তোমার সাথে বেড়াতে বের হলে, বইয়ের দোকান দেখলেই সে আটকে যায়, পরম মমতায় চোখ বুলায় তাকে

সাজানো বইগুলোর ওপর, আর পছন্দের বইটা দেখতে পেলেই নিঃশব্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তোমার হাতে চাপ দিয়ে মিনতি জানায়। একটু ঢুঁ মেরে আসার কথা বলে! তার নেকাবঢাকা চোখ না দেখেও তুমি সে হৃদয়কাড়া চোখের ভাষা পড়ে ফেলতে পার!

* * *

এমন মেয়েকে বিয়ে করো, যে তোমার সন্তানকে পড়তে শেখাবে। কুরআনের গল্প পড়ে শোনাবে। নবীগণের গল্প পড়ে শোনাবে। সাহাবীদের গল্প পড়ে শোনাবে। তাবেয়ীদের গল্প পড়ে শোনাবে। মুজাহিদগণের গল্প পড়ে শোনাবে। ইলম-সাধকগণের গল্প পড়ে শোনাবে। সালেহীনের গল্প পড়ে শোনাবে। বাচ্চাদের দেখাদেখি তুমিও গালে হাত দিয়ে কোন ফাঁকে গল্প শোনায় মগ্ন হয়ে গেছ টেরটিও পাবে না।

* * *

কখনো কোন অদ্ভুত মেয়েকে দেখেছ কোনো পুরোনো বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে বই হাতে গন্ধ শুঁকতে? এই সেই রাজপড়ুয়া। এরা কখনো বইয়ের পাতার গন্ধ না নিয়ে থাকতে পারে না। পাতাগুলো যদি হয় হলদেটে, তা হলে তো আরও না। তাকে দেখবে এক হাতে কফির কাপে চামচ নাড়াতে নাড়াতে আরেক হাতে বই পড়ছে। তার কফির মগে একটু উঁকি দিলে দেখবে, সেখানে এখনো ক্রিম ভাসছে। কারণ, সে এরই মধ্যে ডুবে গেছে তার বইয়ে, লেখকের তৈরি পৃথিবীতে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। আলগোছে বসে পড়তে পার তার পাশটিতে। হয়তো তোমার দিকে একটু কঠিন চোখেই তাকাবে সে! জানো তো, পড়ার মাঝে বাধা পড়াটা মোটেই পছন্দ করে না ওরা। প্রশ্ন কোরো না, বইটা তার কেমন লাগছে। তাকে বরং আরেক কাপ গরম কফি বানিয়ে দিয়ো। সময় থাকলে তুমিও একটা বই নিয়ে বসে পোড়ো।

* * *

এমন একটা মেয়ে খুঁজে বের করো, যে তার পাঠকে শুধু বইয়ের নীরস পাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে দেয় না। জীবন আর জগৎও তার পাঠ্যতালিকায় থাকে। তোমার হাসিকেও যে পড়তে জানবে। তোমার কান্নাকেও সে পড়তে জানবে। তোমার আনন্দ আর বেদনাকেও সে পড়তে জানবে। তোমার চাওয়া-পাওয়াকেও যে পড়তে জানবে। প্রতিসন্ধ্যায় তোমার ক্লান্ত-শ্রান্ত মলিন বিষণ্ন মুখ দেখেই যে সারা দিনকে গড়গড় করে পড়ে ফেলতে পারবে। তোমার সপ্তাহান্তে-মাসান্তে বাড়ি ফেরার অবস্থা দেখেই যে পুরো মাসের আয়-ব্যয়ের হিশেব পড়ে ফেলতে পারবে।

* * *

এমন মেয়েকে বিয়ে করো, যাকে তুমি জানাতে পার ইবনুল কাইয়িমের লেখা তোমার কেমন লাগে। ইমাম গাযালীর বই তোমাকে কেমন নাড়া দেয়। আশরাফ আলি থানবী তোমাকে কেমন পরিশুদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করে! আলী নাদাবীকে নিয়ে তুমি আসলেই কী ভাব, সেটা জানাও। তার কাছে জানতে চাও, জীবনের প্রথম মনে দাগকাটা বই কোনটা? দেখবে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে হড়বড় করে কিছু বইয়ের নাম বলে দেবে। না বললেও সমস্যা নেই। প্রিয় বই থাকতেই হবে, এমন কোনো নিয়ম অবশ্য নেই।

* * *

পড়ুয়া মেয়েকে বিয়ে করে, তার সাথে প্রেম করাই সবচেয়ে সহজ। যেকোনো উপলক্ষেই তাকে বই উপহার দিয়ো। গানে, কবিতায় অথবা চিঠি লিখে কথার মালা উপহার দিয়ো। তার সাথে মন খুলে কথা বোলো। কথা মানেই যে ভালোবাসা এটা সে ঠিকই বুঝবে। তোমাকে বুঝতে হবে, সে বই আর বাস্তবের জগতের পার্থক্য করতে জানে। তবে এটাও সত্যি, সে তার জীবনটাকে কিছুটা হলেও তার প্রিয় বইটার মতো করে গড়ে নিতে চাইবে। চাইতেই পারে। এটা দোষের কিছু নয়। সে বইয়ে পড়া নায়কদের মতো করে তার সন্তানদের গড়ে তুলতে চাইবে। এতে বিচিত্র কিছু নেই একটুও। অন্তত কোনো না-কোনোভাবে তাকে চেষ্টাটা তো করে দেখতে হবে। খেয়াল রাখবে, তার প্রিয় বই যেন কেবল কুরআনই হয়। দিনশেষে সীরাতপাঠই যেন হয় তার প্রধান আকর্ষণ! সাহাবী আর সাহাবিয়াদের জীবনীই যেন থাকে তার পাঠ্যতালিকার শীর্ষে!

* * *

একটা পড়ুয়া মেয়ে খুঁজে পেলে, তাকে আপন করে নিয়ো। রাত দুটোয় ঘুম ভেঙে যদি হঠাৎ দেখো সে একটা বই বুকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদছে, এক কাপ চা দিয়ো তাকে, তারপর শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখো। কিছুক্ষণের জন্য সে হয়তো হারিয়ে যাবে, তোমার হয়তো মনে হবে তোমার বুকে মাথা রেখেও সে আসলে হেঁটে বেড়াচ্ছে অন্য কোনো জগতে, ভয় পেয়ো না, শেষ পর্যন্ত সে তোমার কাছেই ফিরে আসবে। সে এমনভাবে কথা বলবে, যেন বইয়ের চরিত্রগুলোই বাস্তব। কারণ, কিছুক্ষণের জন্য তারা আসলেই তা-ই।

* * *

তোমরা তোমাদের জীবনের গল্প লিখবে। সুন্দর সুন্দর নামের ফুটফুটে সব বাচ্চা থাকবে তোমাদের, নামের চেয়েও বেশি সুন্দর হবে তাদের রুচি-

বোধ, ভালোলাগা-মন্দলাগা। তাকওয়া-পরহেযগারী। ইবাদত-বন্দেগী। আদব-আখলাক।

* * *

বুড়ো বয়েসে শীতকালে তোমরা একসাথে হাটতে বের হলে, সে নিচু গলায় কুরআন তিলাওয়াত করবে বা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে হাঁটবে। বারান্দায় বসে থাকবে। বাগানের বড় শিউলি গাছটির ছায়ায় চেয়ার পেতে বসবে।

* * *

পড়ুয়া মেয়েটিকে বিয়ে করে, তার সাথেই প্রেম করো, কারণ তুমি তারই যোগ্য। কল্পনায় যত রং ধরা দেয় তার সবটুকু দিয়ে যে মেয়ে রাঙিয়ে দিতে পারবে তোমার জীবন, এমন মেয়েই তোমার পাওয়া উচিত। তবে একঘেয়েমি, সস্তা সময়, বোধহীন ভালোবাসা অথবা আনাড়ি প্রস্তাব ছাড়া যদি আর কিছু তোমার তাকে দেয়ার না থাকে, তবে নিজেকে তৈরি করা পর্যন্ত তোমার একা থাকাই ভালো। তুমি যদি পৃথিবী এবং এর বাইরের অন্য সব পৃথিবীকে পেতে চাও, একই সাথে বাঁচতে চাও অনেকগুলো জগতে, উপভোগ করতে চাও অনেক রঙের সময়কে, তা হলে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করো, যে পড়তে ভালোবাসে। অথবা সবচেয়ে ভালো হয় যদি সেই মেয়েটিকে বিয়ে করো, যে লিখতে ভালোবাসে।

* * *

মানছি, সচরাচর এমন মেয়ে পাওয়া দুষ্কর! ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। অন্তত এমন একটা মেয়েকে খুঁজে পেলেও চলবে, যে জীবনে কোনোদিন বই ছুঁয়েও দেখেনি সত্য, কিন্তু অন্যকে পড়তে দেখলে পরম মমতামাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। যে মেয়ে নিজে না পড়লেও তোমার পড়ার ব্যাপারে সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করবে। তোমার বইটা, কলমটা, খাতাটা এগিয়ে দেবে। গুছিয়ে দেবে। অফিসে যাওয়ার পথে, মাদরাসায় যাওয়ার পথে, সফরে বের হওয়ার পূর্বমুহূর্তে তোমার ব্যাগে কয়েকটা বইও নিজে বেছে বেছে দিয়ে দেবে।

* * *

এমন একটা মেয়েকে খুঁজে বের করো, যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে মুখস্থ কুরআন তিলাওয়াত করাকেই সেরা 'বইপাঠ' মনে করে পরম পরিতৃপ্ত থাকবে। জাগতিক সমস্ত ঠুনকো বইকে পাশে ঠেলে, কুরআনকেই সবলে আঁকড়ে ধরে থাকবে। তোমার শত চেষ্টাতেও যে তথাকথিত সস্তাদরের লুতুপুতু পেরেম-পিরিত তো দূরস্থান, 'বোরকা-দাড়িমাখা ছিঁচকাঁদুনে

ইসলামী-প্রেমপূর্ণ' বই পড়তেও আগ্রহবোধ করবে না। এসব তার কাছে ছাইপাশ বলেই মনে হবে। তার কাছে ভালো লাগবে খাদীজার জীবনী পড়তে। আয়েশার জীবনী পড়তে। খাওলার জীবনী পড়তে। ফাতেমার জীবনী পড়তে।

* * *

অন্তত এমন একটা মেয়ে খুঁজে দেখো, যে বই পড়ে না সত্য, তবে নামায পড়বে। বেশ আগ্রহ আর ভালোবাসা নিয়েই পড়বে। যে মেয়ে বোরকা পরবে। শুধু তা-ই নয়, তোমাকেও নামায পড়তে সাহায্য করবে। তোমাকে দ্বীন মানতে উদ্বুদ্ধ করবে।

* * *

খবরদার! এমন মেয়েকে ভুলেও বিয়ে কোরো না, যে তোমার দিক থেকে শত ভাগ ভালোবাসা পেয়েও, তোমাকে সামান্যতম ভালোবাসা দিতে আগ্রহী নয়। সে তার 'পড়াপড়ি' ও 'লেখালেখি' নিয়ে হরদম ব্যস্ত থাকে। এমন মেয়েকে ভুলেও বিয়ে কোরো না, যে বইয়ের পোকা। যে কোনো বই পেলেই চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। একনিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে। এদিকে তোমার জীবন লাইব্রেরিতে দাউদাউ করে আগুন লেগে গেলেও, পড়া তো দূরের কথা, ভ্রুক্ষেপও করে না। সে তার আপন 'শিল্প সাহিত্যচর্চা' নিয়েই আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে! এরা আর যা-ই হোক, কারও ঘরনি হওয়ার যোগ্য নয়। এরা মাকাল ফল। দূর থেকে কল্পনার মানসী হিশেবেই মানায়! সংসারে নয়। এমন মেয়ে খারাপ সেটা বলছি না; তারা বউ হিশেবে ভালো কি না, সেটা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছি মাত্র!

* * *

বেশি খোঁজাখুঁজি না করে, নিতান্ত সাধারণ একটা মেয়ে পেলেও বিয়ে করে ফেলো। শুধু দেখো সে মেয়ে পর্দা করে কি না। নামায পড়ে কি না। শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে কি না। তবে যদি সম্ভব হয়, গোপনে খোঁজ নিয়ো, মেয়েটার মা তার স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করত কি না। তা হলেই তুমি মেয়ের 'স্বভাবধর্ম'ও বের করে ফেলতে পারবে! এমন একটা মেয়ে পেলে, তাকে বিয়ের পর নিয়মিত বইপত্র কিনে দিয়ো। দুজন মিলে মাঝেমধ্যে বই পড়তে বোসো। মেঘলা দুপুরে বা উদাস বাসন্তী রাতে জোছনায় বসে তাকে বই পড়ে শুনিয়ো! পড়ুয়া মেয়ে পাওনি তো কী হয়েছে, তুমি পড়ে শোনালে পরম ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টিতে পাশটিতে বসে তোমার পড়া পড়া শুনলেও চলবে।

* * *

আর কাগজের বই পড়াই কি একমাত্র পড়া! জীবনখাতা পড়তে পারাও কম যোগ্যতা নয়। স্বামী-সংসার-সন্তানের আদর-আবদার পড়তে পারাও কম কিছু নয়। বলা ভালো এটাই সেরা পাঠাভ্যাস! এমন পড়ুয়া মেয়েকেই পারলে বিয়ে কোরো! কাগজের বই নয়, জীবনগ্রন্থ পড়ুয়ারাই সেরা পড়ুয়া!

* * *

আরও ভালো হয় যদি মেয়েটা সূরা আনফাল-তাওবা-মুহাম্মাদের আদর্শে বিশ্বাসী হয়। এককোষী প্রাণী অ্যামিবার মতো মেরুদণ্ডহীন না হয়। এমন একটা মেয়ে পাও কি না দেখো : যে তোমাকে সূরা আনফাল পড়ে শোনাবে। সূরা তাওবার তাফসীর পড়ে শোনাবে। সূরাতুল কিতাল (মুহাম্মাদ)-এর আয়াতগুলো দেখিয়ে তোমার মনকে দ্বীনের জন্যে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করবে। পারলে একপ্রকার ঘর থেকে ঠেলেই 'মেহনতে' পাঠিয়ে দেবে। তোমার সন্তানদেরও সে আদর্শে গড়ে তুলবে!

* * *

অশেষ কৃতজ্ঞতা লেখার মূল উৎস ও অনূদিত দ্বিতীয় উৎসের প্রতি।

জীবন জাগার গল্প : ৬৮০

আমার বিয়ে ও বিবি

শায়খ তানতাবী রহ. একবার নিজের জীবনাভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন। জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে দাম্পত্যজীবন, বিয়ে, সংসার নিয়ে কিছু পরামর্শ তুলে ধরেছিলেন। শায়খের বক্তব্যকে আরবের আরেক ভাই নিজের মতো করে সাজিয়েছেন। যোগ করেছেন আরও কিছু অভিজ্ঞতা! তিনি লিখেছেন :

স্বামী আর স্ত্রীর সম্পর্কের আঙ্গিকটা নানারকমের হয়ে থাকে। আমি জীবনে অনেক পুরুষ দেখেছি, দাম্পত্যজীবনে নিজেকে সুখী বলে দাবি করেছে! যত ভালোই থাকুক, স্বীকার করতে কেন যেন আমতা আমতা করে! ভাবটা এমন যেন সুখে থাকাটা অন্যায়! ঘরনি একজন ভালো মানুষ, এটা স্বীকার করা লজ্জার! নিজেকে দুঃখী প্রমাণ করাটা গৌরবের! অথচ মানুষটা পারিবারিক-জীবনে খুবই সুখী! কিছু মানুষ নিজেকে উল্টো করে প্রকাশ করতে পছন্দ করেন। মানুষ স্বভাবগতভাবে অকৃতজ্ঞ! এটা আল্লাহ তা'আলাই কুরআনে বলে দিয়েছেন।

* * *

এ ধরনের আচরণ করার কারণ, তার আজন্ম লোভ। অল্পে তুষ্টির মনোভাবের অনুপস্থিতি। আরও চাই আরও চাই, খাই-খাই মানসিকতা! তার মনের গহিনে লুকিয়ে আছে।
-সে কেন আরও সুন্দরী হলো না! তার বাবা কেন আরও পয়সাওয়ালা হলো না! সে কেন আরও গুণবতী হলো না! তার সবর-শোকর কেন যে আরও মজবুত হলো না!

* * *

অনেক মানুষই, জীবিত থাকাকালে স্ত্রীর কদর বোঝে না। দাম দেয় না। মূল্যায়ন করতে চায় না। মরে গেলে, তখন হা-হুতাশ করে বেড়ায়! কদর বাড়ে! টান বাড়ে! কথায় কথায় প্রকাশ পেতে থাকে মৃত স্ত্রীর নানা গুণের ফিরিস্তি! জীবনে তার অবদানের দীর্ঘ তালিকা! এখন ভালোবাসা প্রকাশ করে কী লাভ? সুখপাখি উড়ে গেছে! অচিন দেশে!

* * *

বিয়ের সময় হলো। আব্বু বিয়ে করিয়ে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি তাকে স্ত্রী হিশেবে পেয়ে অত্যন্ত সুখী। একথা আমি তার সামনেই অকুণ্ঠগলায় স্বীকার করি! সে লজ্জা পায়! বিব্রতবোধ করে! আবার কৃতজ্ঞও হয়! উৎসাহ পায়!
বিয়ে নিয়ে আমার কিছু পর্যবেক্ষণ আছে। চিন্তা আছে। এসব চিন্তা আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তুলে ধরেছি। বিভিন্ন গুণীজনের সাথেও আলোচনা করেছি। রেডিও কথিকাতেও সম্প্রচার করেছি!
এক. সম্পূর্ণ অপরিচিত ভিন জাতি-গোষ্ঠীর কাউকে পারতপক্ষে পাত্র-পাত্রী হিশেবে মনোনীত না করা। যার সাথে আমার ভাষা, রুচি, খাবার-দাবার কোনো দিকেই মিল নেই, তার সাথে দাম্পত্যজীবন সুখের হওয়াটা কঠিন বৈকি! তবে হ্যাঁ, মনের মিলটাই আসল।

* * *

আমার বিয়ের সময় আব্বু-আম্মু এ বিষয়টা খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছিলেন। তারা আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, আমরা কনেপক্ষকে চিনি, কনেপক্ষও আমাদের চেনে, এমন পরিবারে সম্বন্ধ পাতাবেন। তা হলে পরবর্তীতে ভুল বোঝাবুঝির মাত্রা কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে! ঘটকের মারফতে সম্পূর্ণ অপরিচিত মহলে সম্পর্ক করলে পরবর্তীতে চাওয়া-পাওয়ায় গরমিল দেখা দেয়। শুনেছে, মেয়ে ঘরের কাজে নিপুণা, এখন দেখা যায়, কুটোটিও নাড়তে জানে না। মেয়েপক্ষ শুনেছে, পাত্র

তুখোড় শিক্ষিত! পরে দেখা গেল, তিনি 'বকলম'! এটা কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নয়। ব্যতিক্রম ঘটার পরও সুখ হয়েছে, এমন দম্পতির অভাব নেই। কথাগুলো শুধু সতর্কতার জন্যে বলছি।

* * *

বিয়ের আগে ঘটক বলেছে, পাত্র খুবই রসিক! মনে কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই, পরে দেখা গেল, ওই লোক জীবনে কখনো হেসেছে কি না সন্দেহ! তার পেটে যেন জিলিপির 'পাক'। আমি বিয়ের আগে পাত্রীকে না দেখলেও পাত্রীর পরিবারের সাথে পরিচিত ছিলাম। আমার শাশুড়ি ছিলেন দামেশকের বড় মুহাদ্দিসের কন্যা। শায়খ বদরুদ্দীন হুসাইনী রহ.। আমার নানাশ্বশুরও ছিলেন দ্বীনদার মানুষ। বাবা-মা উভয় দিকের আত্মীয়স্বজনই সম্ভ্রান্ত! সুশীল! বনেদি! মা-শা-আল্লাহ, তাদের মেয়েটাও উভয়দিকের যাবতীয় গুণ নিজের মধ্যে ধারণ করেছে!

* * *

দুই. আমি আর আমার স্ত্রী প্রায় সব দিক দিয়েই সমপর্যায়ের। আমার আব্বু আর শ্বশুর আপিল বিভাগে একই পদে চাকরি করতেন। আমিও পড়াশোনার পাট চুকিয়ে আপিল বিভাগেই চাকরি নিয়েছি। শ্বশুরবাড়ির জীবনধারা, চালচলনের সাথে আমাদের খুব একটা অমিল ছিল না। রান্নাবান্না, কথাবার্তা সবই প্রায় এক ছিল। বিয়ের পর আমাদের দুজনকেই খুব বেশি কিছু ছাড় দিয়ে মানিয়ে চলতে হয়নি। ফলে ঝগড়া-মনোমালিন্য ঘটার সুযোগ ছিল না বললেই চলে। এ জন্যেই হানাফী মাযহাব মতে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সমকক্ষতা (الكفاءة) জরুরি। এসব বিষয়ে হানাফী ফকীহগণের দ্বীনি বুঝ অনেক গভীর আর বাস্তবসম্মত!

* * *

তিন. সে সময় মেয়েরা ঘরেই লেখাপড়া শিখত। তাদের জন্যে আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। মানে, পর্দানশীন নারীদের। ফরাসিরা অবশ্য অনেক চেষ্টা করেছিল, তাদের ঘর থেকে বের করতে। তিউনিশিয়াতে যেমন সফল হয়েছিল, আমাদের সিরিয়াতে ততটা সফল হতে পারেনি! আমার 'ঘরনি' ঘরোয়া মাদরাসার 'তালিবা'। প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ডিগ্রি তার ছিল না। তাই তার দিল-দেমাগ ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন! সেখানে বিন্দুমাত্র কলুষতা ছিল না। এখন আমাদের বিয়ের তেরো বছর চলছে! এখনো আমি প্রত্যহ তার মেধা-মননে মুগ্ধ হয়েই চলেছি।

কায়রো-দামেশক-বাগদাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কত শত শত ছাত্র পড়িয়েছি। ছাত্রীদের খাতা দেখেছি! মাস্টার্স পর্যায়ের কত সেরা মেয়ের মেধা যাচাই করেছি, কিন্তু কাউতে তার মতো পাইনি। হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর চেয়ে 'তথ্যজ্ঞানে' অগ্রণী অনেক মেয়ে দেখেছি, কিন্তু চিন্তা ও মননের শুদ্ধতা? তার ধারেকাছেও কাউকে দেখিনি! আমি এটা বলছি না, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণকারী মেয়েদের মধ্যে শুদ্ধতা নেই! তাদের মধ্যে পবিত্রতা নেই! তবে ইংরেজ ও ফরাসিদের রেখে যাওয়া শিক্ষা-কারিকুলাম এমন ছাঁচে সাজানো যে, এটা অতিক্রম করার পর, মেয়ে তো বলাই বাহুল্য, অনেক ছেলের মধ্যেও স্বভাবজাত 'শুচিতা'র বিকৃতি ঘটে!

পাশ্চাত্যের রেখে যাওয়া শিক্ষা মেয়েদের যেমন অক্ষরজ্ঞান বিলায়, পাশাপাশি মেয়েদের 'অন্তরজ্ঞান' ছিনায়। এ শিক্ষা মেয়েদের কিছু দেয় আর বহু কিছু নেয়! সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এ শিক্ষাব্যবস্থা নারীকে পুরুষ হতে উদ্বুদ্ধ করে। পুরুষ হতে উস্কানি দেয়। ঘরের নিরাপদ ক্রোড় ছেড়ে অপমানজনক অলিগলিতে অসম্মানের পথ বেছে নিতে উৎসাহিত করে। তার থেকে নারীসুলভ কোমলতা, নম্রতা দূর করে দেয়। ব্যতিক্রম যে নেই তা বলব না। একজন নারী যত শিক্ষিতই হোক, সে একজন মা ও একজন স্ত্রী, এর চেয়ে বড় কোনো সম্মান বা পদ হতে পারে না।

আমার কিছু কথা, কিছু লেখা, উচ্চশিক্ষিত মেয়েরা বুঝতে না পেরে প্রশ্ন পাঠাত! অথচ আমার স্ত্রী ন্যূনতম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই, প্রায় সব লেখা ও কথা অনায়াসে বুঝতে পারে। কখনো কখনো তো ভুলও ধরিয়ে দেয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অবশ্যই জরুরি! কিন্তু সেটা যেন ইসলামবান্ধব ও নারীবান্ধব হয়! পাশ্চাত্যবান্ধব নয়। পাশ্চাত্যবান্ধব শিক্ষা তাকে কিছু খোসা দেয়, তার মধ্য থেকে 'দানা'টা কেড়ে নেয়। এ শিক্ষা তাকে এমন অনেক বিষয় শিখতে বাধ্য করে, যা তাকে একজন সুখী সফল স্ত্রী হতে, একজন 'সালেহা' মা হতে বাধা দেয়। এমনকি একজন মেয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বেশির ভাগই তার জীবনে কোনো কাজে আসে না!

* * *

চার. আমি বিয়ের আগেও স্ত্রীর বাহ্যিক সৌন্দর্য (الجمال) নিয়ে মাথা ঘামাইনি, বিয়ের এত বছর পরও ঘামাই না। পাত্রী দেখার সময় মায়ের জিজ্ঞাসার সময়ও স্পষ্ট ভাষায় বলেছি :

-চেহারার সৌন্দর্য নয়, মনের সৌন্দর্যটাই আমার আরাধ্য! আপনি তেমন কাউকে পান কি না দেখুন!

তিনি আমাকে নিরাশ করেননি। ঠিক যেমনটা চেয়েছি তার চেয়েও অনেক গুণ বেশি 'সুন্দর' মনের অধিকারী একজনকে পেয়েছি। অনেক সময় তার মানবিক সৌন্দর্যের দ্যুতি এত বেশি 'চমকদার' হয়ে উঠত যে, আমার সব সৌন্দর্য-যোগ্যতা তার সামনে ম্লান হয়ে যেত!

দামেশক ইউনিভার্সিটিতে সময় আমাদের দুই শ নম্বরের দর্শনের সাবসিডিয়ারি ক্লাশে অংশগ্রহণ করতে হতো। পঞ্চাশ নম্বরের নন্দনতত্ত্বও সাথে পড়তে হতো। পড়াতেন ফরাসি এক ভদ্রলোক! নাম ভুলে গেছি! তিনি বলতেন :

-সৌন্দর্যের মূল আধার বাইরের প্রকৃতিতে নয়!

-কোথায় মশিয়েঁ?

-তোমার চোখে! তোমার মনে! সেজন্যে দেখো না, কুচকুচে কালো ছেলেটাও মায়ের চোখে 'ফুটফুটে'? প্রকৃত সৌন্দর্য কখনো খসে যায় না। সৌন্দর্য সম্পর্কে তোমার অনুভূতি-উপলব্ধি খসে যাওয়াকেই তুমি বলে বেড়াও সৌন্দর্য শেষ হয়ে গেছে! আসলে তুমি সৌন্দর্য কী সেটাই তুমি চেনো না।

কত পুরুষকে দেখেছি, ঘরে অতি রূপসী স্ত্রী রেখে আরেক বিদঘুটে নারীর পাণি চেয়ে বেড়াচ্ছে! চেহারার সৌন্দর্যই শেষ কথা নয়। চামড়ার রংই সব নয়। মনের রংই আসল। এ ক্ষেত্রে আমার সব সময় কবি ফারযদাকের একটা লাইন মনে পড়ে। তিনি একজন 'ইমরাউল কায়েসধর্মী' কবি ছিলেন। তার অনেক কবিতা যেন সাক্ষাৎ শয়তানের বাণী! তিনি স্বীয় স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন :

ما أطيبك حراماً وأبغضك حلالاً

হারাম হলে তুমি কী উপাদেয়ই না হতে! হালাল হয়ে কী বিস্বাদ হয়ে আছ!

* * *

পাঁচ. শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সাথে আমার গভীর সম্পর্ক। কিন্তু তারা কখনো সীমালঙ্ঘন করেনি। আমি তাদের মেয়ে-জামাই। তাদের মেয়ে আমার স্ত্রী। আমি আর আমার স্ত্রী জামাই-বউ। শ্বশুরবাড়ির আমাদের চারপাশ ঘিরে থাকত! কিন্তু সে আদরের পরিধি দুজনের একান্ত সম্পর্কে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করত না।

আমি আর স্ত্রী বহুবার ঝগড়া করেছি। মনোমালিন্য হয়েছে। সব পরিবারেই এটা হয়। কিন্তু কখনোই শ্বশুরবাড়ির কেউ যেচে এসে নাক গলায়নি। তাদের অতিউৎসাহী কোনো সিদ্ধান্ত আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়নি। নিজেদের বিরোধ নিজেরাই মিটিয়ে ফেলেছি।

সারাজীবনে আমি ২৫ হাজারেরও বেশি দাম্পত্য-কলহ মামলার রায় দিয়েছি। বেশির ভাগ মামলাই কোর্ট পর্যন্ত গড়ানোর মূল কারণ ছিল স্ত্রীর মা বা বোন। এরা নিজেদের মেয়ে বা বোনকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিলে, চার ভাগের তিন ভাগ মামলা কোর্টে আসার আগেই ডিসমিস হয়ে যেত।

* * *

ছয়. অনেক দম্পতির শুরুর দিনগুলো থাকে মধুময়। চন্দন-পালঙ্কময়, পরের দিনগুলো হয়ে পড়ে কন্টকময় বিষতুল্য। আমি প্রথম দিন থেকেই সচেতন ছিলাম। আমি যেমন, তেমন আচরণই তার সাথে করেছি। নতুন বিবিকে ভোলানোর জন্যে, বুকে বিষ লুকিয়ে রেখে মুখ দিয়ে মধুসুধা বর্ষণ করিনি! সে প্রথম দিন থেকেই আমার আচরণের খারাপ দিকগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে গেছে! মেনে নিতে বাধ্যও হয়েছে! আমিও দিন দিন নিজেকে শুধরে নেয়ার প্রয়াস পেয়েছি। যতই দিন গড়িয়েছে, আমাদের দাম্পত্যজীবন সুখময় হয়ে উঠেছে!

* * *

সাত. আমি সব সময় একটা নিয়ম মেনে এসেছি! বাইবেলের বাণী : 'সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দাও।' আমিও স্ত্রীর প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। তার ঘরোয়া কাজে কখনোই হস্তক্ষেপ করতে যাইনি। সে তার মতো করে ঘর গুছিয়েছে। চার মেয়ে (বানান-বায়ান-আমান-ইয়ামান)-কে নিজের মতো করে মানুষ করেছে। পাশাপাশি সেও আমার এলাকা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। আমি কোথায় পড়াব, কী পড়াব, সেটাতে যেমন সে নাক গলায়নি, আমিও সে কীভাবে বেগুন কাটবে, আলুর টুকরা কত বড় হবে, সেটাতে বাগড়া দিতে যাইনি! উভয়ে অপরের রাজ্যের সীমা মেনে সুখী হয়েছি। সে আমার পাগড়ি নিয়ে টানাটানি করেনি, আবার আমিও তার বোরকা নিয়ে পড়িনি!

* * *

আট. আমি তার থেকে কোনো বিষয় লুকোইনি, সেও কোনো বিষয় আমার কাছ থেকে গোপন করেনি। আমি তার সাথে কখনো মিথ্যা বলিনি, সেও আমার সাথে কখনো অসত্য বলেনি। আমি প্রথম দিনই তাকে আমার আর্থিক সংগতি সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা দিয়েছি। কোথায় যাই না-যাই সবই তাকে জানাতাম। সেও কী করে না করে, আমাকে জানাত। সুযোগ পেলেই আমি তাকে বাইরে নিয়ে যেতাম, সেও আমাকে ছাড়া খুব একটা কোথাও যেত না। আমাদের দেখাদেখি মেয়েগুলোও সততা ও

স্পষ্টভাষিতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে! মিথ্যা আর কপটতাকে তারা মনেপ্রাণে ঘৃণা করতে করতে বড় হয়েছে!
(বলাবাহুল্য, শায়খের বড় মেয়ে জার্মানিতে থাকতেন। সিরিয়ান গোয়েন্দারা তাকে সেখানে নির্মমভাবে শহীদ করে দেয়। বড়ই গুণী মানুষ ছিলেন 'বানান তানতাবী'।)

* * *

নয়. আমি তার মধ্যে যা পেয়েছি, এর চেয়ে বেশি দাবি করিনি। তার যা বুদ্ধি-বিবেচনা-নিষ্ঠা জন্মসূত্রে ছিল, এর বাইরে অতিরিক্ত কিছুর প্রয়োজনও ছিল না। সে প্রাচ্যের আর দশটা মহিলার মতোই! সংসার অন্তপ্রাণা। স্বামী-সন্তানের জন্যে না খেয়ে বসে থাকে। নিজের চেয়ে সংসারের চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়। সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে শেষে নিজে ঘুমুতে যায়। সবাইকে আরাম দিয়ে নিজে আরাম পায়। সবাইকে টিকিয়ে রেখে নিজে নিঃশেষিত হয়। সবার আগে জেগে সবার শেষে শোয়। সারাক্ষণই কিছু না-কিছু করছেই! ঝাড়ু দিচ্ছে। সেলাই করছে। তরকারি কুটছে। সবই আমাদের সুখের জন্যে। আমি লিখতে বসলে, মেয়েদের চুপ রাখছে। ঘুমুতে গেলে ঘরকে ঘুমের উপযোগী করে তুলছে! আমাকে সব ধরনের দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ থেকে দূরে রাখছে! কিছুক্ষণ পর পর এসে চরকির মতো ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে। কখন কী লাগে! ঘুম ভাঙল কি না! ঘুমের মধ্যে হাত-পা বেকায়দায় আছে কি না! মশা উড়ছে কি না! পাখার বাতাস ঠিকমতো লাগছে কি না! কাঁথাটা সরে গেল কি না! টেবিলের কাগজগুলো বাতাসে এলোমেলো হয়ে গেল কি না!

* * *

সে যাকে ভালোবেসেছে, আমিও তাকে ভালোবেসেছি। আমি যাকে অপছন্দ করেছি, সেও তাকে অপছন্দ করেছে। আমাকে খুশি রাখাই যেন তার সার্বক্ষণিক কাজ! গহনা-অলংকারের প্রতি নারীদের সহজাত 'আগ্রহ' থাকেই। তার মধ্যে এটাও ছিল না। সে চাইত আমাদের নিজস্ব একটা বাড়ি হোক! ভাড়া বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে উঠি! তার অলংকার না হলেও কোনো সমস্যা নেই।

* * *

এগারো. সে আমার পরিবারকে ভালোবেসেছে। কিসে তাদের ভালো হবে, সে চিন্তায় বিভোর থেকেছে। আমি কখনো বাবা-মায়ের খোঁজ-খবর রাখতে না পারলেও, সে ঠিকই আমার হয়ে দায়িত্ব পালন করেছে। আমি

বাবা-মায়ের প্রতি কৃত কর্তব্য ভুলে গেলে, সে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। একবার আমার সাথে বোনের ভুল বোঝাবুঝি হলে আমিই চেয়েছি, সেও যেন আমার বোনের সাথে কিছুদিন যোগাযোগ না রাখে! কিন্তু সে পরম আন্তরিকতায় ভাই-বোনে মিলমিশ করিয়ে দিয়েছে।

* * *

বারো. আমি তার জন্যে কী আদর্শ হব, উল্টো সে-ই দিনে দিনে আমার আদর্শ হয়ে উঠেছে! সে ছিল একজন আরব মুসলিম মহিলার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি! স্বামী-সন্তানই যার একমাত্র জগৎ। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, অনেক যুবককে দেখেছি, প্যারিসে গিয়ে, লন্ডনে গিয়ে, পড়াশোনা শেষ করে, দেশে ফিরে এসেছে! হাতে ফুল আর বগলে মেম নিয়ে জাহাজ থেকে নেমেছে! তাদের কাছে প্রাচ্যের হুরতুল্য মেয়েগুলো পছন্দ নয়।

তারা যে মেম নিয়ে ফিরেছে, কিছুদিন যেতে না-যেতেই, আরবের লু হাওয়ায় তাদের না থাকত চামড়ার সৌন্দর্য, আর না থাকত হৃদয়ের সৌকর্য!

তারা পৃথিবী ঘুরে যে মেম নিয়ে ফিরেছে, তারা আমাদের সহজ-সরল মেয়েদের চাকরানি হওয়ারও যোগ্যতা রাখে না। এদেরই আমাদের অর্বাচীন চলতি হাওয়ার পন্থী যুবারা বগলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়! দামেশকের জামে মসজিদ দেখাতে নিয়ে আসে! গদগদ ভঙ্গিতে কথা বলে! অল্প কিছুদিন পরই এই গদগদ ভাবটা গদাগদিতে মোড় নেয়। তবুও মেরুদণ্ডহীন যুবকগুলোর হুঁশ ফেরে না।

* * *

তেরো. বোকা যুবকগুলো মনে করে, ইউরোপ থেকে একটা শাদা চামড়া বগলে বাগিয়ে ফিরতে পারলে কেল্লা ফতে! তারা বিশ্ব জয় করে ফেলেছে! তারা ইউরোপে গিয়ে সাধারণ রাস্তার শাদা চামড়ার শ্রমিক মেয়ে দেখেও উদ্বেলিত হয়ে ওঠে! তাকে বিয়ে করতে পারলে বাকি জীবন নিশ্চিন্ত! তার হাতে আণবিক বোমার চাবি এসে গেছে! সে শাহানশাহ বনে গেছে!

* * *

চৌদ্দ. একজন সত্যিকারের মুসলিম নারীর সাথে পৃথিবীর আর কোনো নারীর তুলনাই চলে না। তারা স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। সন্তানের প্রতি মমতাময়ী থাকে। নিজের ইজ্জত-আবরুর প্রতি সংবেদনশীল থাকে। স্বামীর আদেশ-নিষেধের প্রতি হয় পরম শ্রদ্ধাশীল।

* * *

পনেরো. আমি আমার বিয়ে ও স্ত্রীর কথা বলতে বসেছিলাম। পাশাপাশি প্রসঙ্গক্রমে আরও কিছু কথাও হয়ে গেল। বলতে বসেছিলাম, আমার স্ত্রী আমাকে কতটা সুখী করেছে! একজন স্ত্রী হিশেবে কে কতটা অনুকরণীয়! স্বামীর জন্যে একজন নারী কতটা ত্যাগ করতে পারে! পাশাপাশি আরেকটা সুপ্ত ইচ্ছাও ছিল! যুবকরা যেন যাকে তাকে বিয়ে না করে, দ্বীনদার পাত্রীকে বিয়ে করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে! চেহারার সৌন্দর্যের পরিবর্তে মনের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়! কেউ যদি উদ্বুদ্ধ হয়, তা হলেই আমি সফল!

জীবন জাগার গল্প : ৬৮১

হারানো প্রেম

বাংলাদেশের অন্যতম বড় জংশন। পাশ দিয়েই বাস-রাস্তা। আমরা দুজন রিকশা করে মূল শহরের দিকে যাচ্ছি! রেলে আসার কথা থাকলেও টিকেট পাইনি। অগত্যা বাসে করে আসতে হয়েছে। শহরে প্রবেশের মুখে পেছন থেকে আমার নাম ধরে কেউ ডাকল। এখানে আমাকে কেউ চেনে না। সুতরাং আমাকে ডাকছে না; এটা নিশ্চিত। তাই পেছন দিকে তাকানোর গরজ অনুভব করলাম না। আবার ডাকটা এলা। এবার আরও কাছ থেকে। কিছু ভাবার আগেই মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম। আরে, 'আবদুল্লাহ ভাই' না? তিনি তুরন্ত সাইকেলে চালিয়ে তেড়ে আসছেন আমাদের দিকে। আর হুইল ছেড়ে দিয়ে প্রপেলারের মতো ইয়া লম্বা দু-হাত নেড়ে আমাদের থামতে বলছেন। মুখে সেই অমলিন নিষ্পাপ হাসি! রিকশা থামল! গলাগলি-আঞ্জাআঞ্জি হলো। এক বার দু-বার তিন বার। চতুর্থ বার উদ্যত হতেই সশব্দে আঁতকে উঠে কঁকিয়ে করজোরে মাফ চাইলাম। হাড়-পাঁজরা এমনিতেই মটমট করছে। ব্যায়ামবীর পাহলয়ান মানুষ তিনি! মহব্বতের আতিশয্যে বুকে জড়িয়ে জোরে চাপ দেয়ার সময় খেয়াল থাকছে না, আমি নাদান দুর্বল নাচিজ এক 'ইনসান'!

* * *

আমি তাকে দেখে অবাক! তিনি আমাকে দেখে হতবাক! কিছুক্ষণ অবাক হওয়া-হওয়ি।

-বলো তো, কত দিন পর দেখা হলো আমাদের?

-বারো বছর?

-নাহ, আরও বেশি হবে!

-হবে হয়তো!

-তুমি বিশ্বাস করবে না, তোমাকে কত কতভাবে যে খুঁজেছি! কিন্তু হদিস বের করতে পারিনি! তোমার ভাবির কাছেও তোমার গল্প সব সময় করেছি।

* * *

তার বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ডাকাতিয়া! কত লক্ষ কিউসেক পানি বয়ে গেছে! আশেপাশে কত পরিবর্তন ঘটেছে! কিন্তু 'আবদুল্লাহ' ভাইয়ের কোনো পরিবর্তন নেই! অবিশ্বাস্য রকমের সরল! নিরহংকার! মিশুক! বন্ধুবৎসল। সদালাপী। না হলে দাড়িতে পাক ধরেছে, অনেকগুলো সন্তানের বাবা, মসজিদের খতীব, এলাকার প্রিয় মুরুব্বি হওয়া সত্ত্বেও এভাবে ছেলে মানুষের মতো ডগমগ করে উঠতে পারতেন! আমাকে দেখে উদার হাসিতে কুটিকুটি হচ্ছেন! এক বার হাত ধরছেন, আরেক বার কাঁধে হাত রাখছেন। কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

* * *

আমরা যাচ্ছিলাম দূরের এক গাঁয়ে। দাওয়াতে। কিছু তালিবে ইলমের সাথে সাক্ষাৎ করতে। অজপাড়াগাঁয়ের অবহেলিত এক গরিব মাদরাসা পরিদর্শন করতে। একটু তাড়া ছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ ভাইকে পেয়ে সব ভুলে গেলাম। তিনিও প্রায় ভুলে গেলেন। 'প্রায়' বললাম, কারণ তিনি পুরোপুরি ভুলতে পারেননি। একটু পর পরই ঘড়ি দেখছিলেন আর মোবাইলে কাকে যেন ম্যাসেজ পাঠাচ্ছিলেন। একবার উঠে গিয়ে ফোনে কী সব কথাও বলে এলেন।

তার মতিগতি দেখে বুঝতে পারছিলাম, তিনি আমাদের ছাড়তেও পারছেন না আবার ওদিকে কারও ডাকও অবহেলা করতে পারছেন না। থাকতে না পেরে জানতে চাইলাম :

-ভাবি ডাকছেন বুঝি?

-কীভাবে বুঝলে?

-এসব বোঝার জন্যে কি খুব বেশি 'এলেম' লাগে? 'ঘর পোড়া গরু' না আমরা সবাই!

-তুমি কিন্তু তোমার ভাবিকে চেন।

-আমি চিনি? কীভাবে? আপনার সাথে দেখাই তো হয়নি প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে! কোথায় বিয়ে করেছেন, কাকে করেছেন, কবে করেছেন কিছুই তো জানি না! আমার আত্মীয় কাউকে বিয়ে করেছেন বুঝি?

-আরে নাহ, তোমার আত্মীয় আমি পাব কীভাবে! তোমার বাড়ি কোথায় আর আমার বাড়ি কোথায়? আর তোমার কোনো আত্মীয়কে বিয়ে করলে বুঝি জানতে না!

-তা হলে?

-তোমার কি মনে পড়ে, একদিন 'বায়রা' গ্রামে, এক দুপুরে আমরা ধান তুলছিলাম! এক বাড়িতে দাওয়াত খেয়েছিলাম! চীনা হাঁসের গোশত দিয়ে! ফলি মাছের কোপ্তা দিয়ে!

-ও আল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! আজীব! এ যে রূপকথাকেও হার মানাবে! কীভাবে সম্ভব হলো? সব না বললে আজ আর ছাড় নেই! ভাবি রাগ করলে করুক গে!

-তোমার কথা শুনলে রাগ দূরের কথা, খুশিতে অন্য দিনের তুলনায় একটু বেশি আদরই করতে পারে।

-আগের মতোই রসিক আছেন দেখছি!

* * *

আবদুল্লাহ ভাই সেবার বাড়ি থেকে এলেন। ভীষণ মনমরা অবস্থায়। চোখ দুটো গর্তে ডুবে গেছে। দু-গাল বসে গেছে। উস্কো খুস্কো চুল। দৃষ্টিতে কেমন দিশেহারা ভাব!

-কী হলো! কী হলো? অমন হাসিখুশি মানুষটার এ হাল কেন? বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি তো! কেউ ইন্তেকাল করেছেন?

-না।

-তা হলে?

মুখ খোলে তো খোলে না! বেচারা বাড়ি গেলেন এই সেদিন! আমরা বাসে তুলে দিয়ে এসেছিলাম। ছুটির মাত্র কয়েকটা দিন অতিবাহিত হয়েছে! আমরা ক'জন মাদরাসায় পাহারায় আছি। বড় হুজুর ঢাকা গেছেন। কালেকশনে। পড়াপড়ির চাপ নেই। আমাদের হাতেই পুরো মাদরাসার চাবি ও কাঠি। রান্নাবান্নার জন্যে হুজুর বেশ কিছু টাকা দিয়ে গেছেন। মাদরাসার পুকুরে অজস্র ঘাই দেয়া মাছ। হুজুর খাওয়ার অনুমতি দিয়ে গেছেন। শুধু ক'টা মাছ খাচ্ছি, সেটা ওজন করে খাতায় টুকে রাখতে হবে। আমরা মাদরাসায় মোরগ পুষতাম! সেগুলো দিলচাসপ মনোহর ভঙ্গিতে কক কক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে! রোজ একটা করে 'হালাল' করা হচ্ছে। মাদরাসার গাছে নারিকেল! কচি কচি শাঁসালো ডাব! খাও আর হিশেব রাখো! হুজুর এসে দাম পরিশোধ করে দেবেন! রীতিমতো স্বর্গসুখ!

হুজুর না থাকাতে মসজিদও খালি। আমি ছোট বলে আজানের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপল! বড়রা পালা করে ইমামতি করেন! রাত জেগে মাদরাসা পাহারা দিতে হয়! সে আরেক মহা-আনন্দের ব্যাপার! কাপের পর কাপ চা উড়ছে! এই রাতগুলো অবশ্য খুবই অর্থবহ হয়ে কাটত! সারা রাত একটানা কুরআন তিলাওয়াত! তাহাজ্জুদে আর শবিনায়! সকালে ফজর পড়ে ম্যারাথন ঘুম! হুজুর যাওয়ার আগে পইপই করে বলে গেছেন :
-রাতের বেলা বেশি ঘোরাঘুরি করবি না! শুধু কুরআন তিলাওয়াত করবি!

* * *

আমরা প্রিয় হুজুরের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল করেছি। খাওয়া ও পড়া উভয় ক্ষেত্রে। আনুগত্যটা খাওয়ার বেলাতেই বেশি হয়ে গেছে! এভাবে দুদিন কেটে গেল। আবদুল্লাহ ভাইয়ের মনমরা ভাব আস্তে আস্তে কেটে যেতে লাগল! তৃতীয় রাতে আমাদের চাপাচাপিতে আর থাকতে পারলেন না। তার জন্যে স্পেশাল টি বানানো হলো! ইউসুফ ভাই কীভাবে যেন, চায়ের মধ্যে কাঁচা ডিম দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে একটা চা বানাতেন! বেশি করে দুধ দিয়ে! যা মজা হতো না, বলার নয়! মাঝেমধ্যে আমরা ভাতের খরচা বাঁচিয়ে ডিম কিনে আনতাম! স্পেশাল টি খাওয়ার লোভে! এমন চায়ের অফার কেউ ঠেলতে পারে! আবদুল্লাহ ভাইয়ের মন ভিজে এল! এবার ঝাঁপি খোলার পালা! টানটান উত্তেজনা নিয়ে ইশা পড়লাম! উত্তেজনার কারণে হোক বা অন্য কোনো কারণে, ইউসুফ ভাই ইমামতি করতে গিয়ে তিন বার কেরাতে ভুল করলেন। সূরা ফাতেহাতে আটকালেন! মান-ইজ্জত সব শেষ করে, তিনি লোকমা খেলেন মসজিদের মূর্খ সভাপতির কাছে! কী আর করা! নামাজ শেষ করে সভাপতি সাহেবের সে কী বীরদর্প চাহনি! সালাম ফিরিয়েই পুবমুখী হয়ে বসলেন! ভাবটা এমন, দেখো দেখো কেরদানি! ইমাম সাবের ভুলও আমি ধরতে পারি! আর তোরা আমাকে পিছনে পিছনে 'মূর্খ খইল্যা' বলে গালি দিস!

* * *

বিশেষ রেসিপিতে মোরগের 'ব্যঞ্জন' রন্ধন করা হলো। বাইশ পদ মশলা দিয়ে। খেতে যা মজা হয়েছে না, সে আর বলার নয়! সবকিছুই গল্পের লোভে! ঘুষ বা ঘুষি যা-ই বলি! আবদুল্লাহ ভাই রীতিমতো ভজে গেলেন! বুঝে গেলাম এবার আমাদের মজে যাওয়ার পালা! 'তা হলে শোন' বলে শুরু করলেন :
-আমাদের বাড়িটা একান্নবর্তী! চাচা-জ্যাঠারা সবাই একসাথে থাকে। এক পাতিলের রান্না খায়। যত দিন বুড়ি দাদু আছেন, তত দিন এর ব্যতিক্রম

হওয়ার জো নেই! প্রয়োজনও নেই। সবাই বেশ সুখী! চাল-ডাল আনাজ-পেঁয়াজ কিনতে হয় না। সব খেত থেকে আসে! হিশেব-নিকেশ থাকে দাদাজানের কাছে। খাওয়া-দাওয়ার পর যা বাঁচে সব বিক্রি করে নগদ টাকা তিনি ছেলে-মেয়েদের বিলিয়ে দেন! সব ছেলের জন্যে আলাদা আলাদা ঘর উঠিয়ে দিয়েছেন! হাটে আলাদা করে দোকান করে দিয়েছেন! জমি-জমাও মৌখিক বিলি-ব্যবস্থা হয়ে আছে! সুতরাং হিংসা জন্ম নেয়ার সুযোগ নেই।

* * *

তোরা তো জানিস আমি ক্লাস নাইন থেকে টেনে উঠে মাদরাসায় চলে এসেছি! আমার এই অদ্ভুত খেয়াল শুনে সবাই বেঁকে বসলেও একমাত্র দাদাজি আমার পক্ষে দাঁড়ানোতে কেউ মুখ খুলতে সাহস করল না। দাদাজি নিজেই এনে আমাকে ভর্তি করিয়ে দিয়ে গেছেন! এমনকি ঘোষণা দিয়েছেন, আমি হাফেজ হতে পারলে তার নিজস্ব সম্পত্তি থেকে আমার জন্যে বড় একটা অংশ লিখে দেবেন। দাদুও বলেছেন, তার বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া সম্পত্তি আমার নামে করে দেবেন। দাদা-দাদুর কারগুজারি দেখে চাচা-জ্যাঠা তো বটেই, চাচিরা পর্যন্ত আমার জন্যে বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করে বসলেন! আমাদের বংশে আর কোনো হুজুর নেই যে! আর পুরো গ্রাম ঢুঁড়লেও একজন আলেম দরকিনার, শুদ্ধ করে কুরআন পড়তে পারে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ!

* * *

আল্লাহর কী ইচ্ছা, যে মানুষ স্কুলে কোনোরকমে টেনেটুনে ঘষটা ঘষটি করে সীমানা পার হতো, ফি বছরই সর্বমোট নম্বর প্রায় কানের পাশ ঘেঁষে যেত, সে-ই কি না এখানে এসে এক বছরে খতম শেষ করে কিতাবখানায় ভর্তি হয়েছে! বাড়ির সবাই যে কী খুশি! তোদের বলে বোঝাতে পারব না! দাদাজান খুশি হয়ে সেবার মাদরাসায় গরু দিলেন না! মাদরাসার ইতিহাসে আর কেউ এভাবে গোটা গরু দান করেননি। এত যত্ন করে কেউ চিকন চাল দিয়ে জেয়াফত খাওয়ায়নি। গ্রামেও দাদাজান হুলুস্থুল এলাহি কারবার করেছেন! আমাদের গ্রামে শবিনা খতমের প্রচলন আছে। দাদাজি বটতলা বাজার থেকে মাইক ভাড়া করে এনেছেন। আমাকে দিয়ে শবিনা খতম করাবেন বলে। আমিও মহা উৎসাহে প্রায় একাই পুরো কুরআন পড়েছি! তোরা তো ছিলি, সেকথা আর বলার দরকার নেই!

* * *

হেফজ শেষ করার পর, আমি চিল্লায় গিয়েছিলাম। আমাদের জামাতের আমির ছিলেন এক মুফতী সাহেব। দেওবন্দ থেকে পড়ে এসেছেন। পাকিস্তান যাবেন আরও পড়ার জন্যে! দ্বীনের অনেক কিছুই তার কাছে শিখেছি চল্লিশ দিনে। চিল্লার প্রায় সব ঘটনা তোদের আগেও বলেছি! আগে আমি পর্দা করতাম না! তাবলীগ থেকে ফিরে পুরোপুরি খাস পর্দা শুরু করে দিলাম। চাচিদের সাথে দেখা দেয়া বন্ধ করে দিলাম। সবাই বেজায় নাখোশ! আমি অটল! সবাইকে বোঝালাম! ওই যে, একবার বড় হুজুরকে নিয়ে গেলাম না আমাদের বাড়িতে! সেটা হুজুরকে দিয়ে পর্দার ওয়াজ শোনানোর জন্যে। হুজুরের কথা শুনে সবাই মেনে নিল। বেশ আর কম পর্দা করা শুরু করল। আমাদের বাড়িকে লোকজন জামেদ মাঝির বাড়ি বলে চিনত। আব্বুর দাদার নাম। বাড়ির বর্তমান চাল-চলন দেখে সবাই হুজুর বাড়ি বলে ডাকতে শুরু করল। মাত্র কয়েক জামাত পড়েছি, এর মধ্যে আমার কাঁধে জুমার দায়িত্ব চেপেছে। বাড়ি গেলে ওয়াজ করতে হয়। দাদাজি কী মনোযোগ দিয়েই না আমার ওয়াজ শোনেন! পরম তৃপ্তিতে তার দু-চোখ মুদে আসে! একবার তো বলেই ফেললেন :

-ভাই, তোর জন্যেই মনে হয় আমার ইহজনম সার্থক! কবরে গেলে আল্লাহ আমারে মাফ করে দেবেন!

* * *

সবার আদরে যত্নেই আমার দিনগুলো কেটে যেতে লাগল। এবার ভেবেছিলাম বাড়ি যাব না। বড় হুজুরও বলেছিলেন, পুরো ছুটিটা মাদরাসা পাহারায় থাকতে! আমিও প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু দাদাজান এসে জোর করে নিয়ে গেলেন! বাড়ি গিয়ে শুনি বিয়ে! আমার জ্যাঠাতো বোনের! কোমর বেঁধে আয়োজনে নেমে পড়লাম! আমিই বাড়ির বড় ছেলে। বড় বোন আছে, কিন্তু ছেলে বলতে আমি একাই! ছোট চাচ্চুর অবশ্য দুই ছেলে। তারা একেবারে পিচ্চি! বিয়ে উপলক্ষে দাদা সব আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দিয়েছেন। পুরো বাড়ি ভর্তি মেহমান। গিজগিজ করছে। পা ফেলার জায়গা নেই। খাবার-দাবারের এলাহি আয়োজন! যত ইচ্ছা খাওয়ার দেদার বন্দোবস্ত!

* * *

আমার শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে দাদাজানের সাথে! তার সাথে ভয়ে কেউ থাকতে চায় না। একমাত্র আমার সাথেই তার যত খয়-খাতির! তার যাবতীয় হিশাব-পত্তরও আমি রাখি এখন। বৃহস্পতিবারে বাড়ি গেলে, পুরো সপ্তাহের বাজারের খতিয়ান খাতায় তুলে রাখতে হয়। বিয়ের এখনো

আরও দুদিন বাকি। দাদাজান শিউরি বাজারে গেছেন। মাছের অর্ডার দিতে। কাঁচা বাজারও সেরে আসবেন। সেখানে দইটা ভালো হয়, পারলে বায়না দিয়ে আসবেন ময়রার কাছে।

আমি একমনে হিশাব লিখছি। দাদু কামরার শেষ মাথায় তসবি টিপছেন। দাদুর অনেক দিনের অভ্যেস। মাগরিব পড়ে জায়নামাযে বসে বসে জিকির করা। আজও করছেন। দাদাজির কামরাটা বলতে গেলে বিশাল! বাড়ির প্রায় সবকিছুই এখানে রাখা। লোহার সিন্দুক থেকে শুরু করে হাড়ি-পাতিল পর্যন্ত! মনোযোগ ভঙ্গ হলো চুড়ির টুংটাং আওয়াজে। চোখ তুলে তাকিয়েই আমি আকাশ থেকে পড়লাম! অজান্তেই মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল:

-শিউলি তুই!

* * *

শিউলি আমার জ্যাঠতো বোন। তারই বিয়ে। আমার অনেক ছোট। প্রায় পাঁচ কি ছয় বছরের ছোট! আরও বেশিও হতে পারে। আমি পর্দা শুরু করার পর থেকেই তার সাথে আর দেখা নেই। দেখা নেই বললে ভুল হবে! আমি পর্দা করতে চাইলেও, সে নানা ছুতোয় আমার সামনে পড়ত!হয়তো আমি গোসল করতে যাচ্ছি, সে কীভাবে যেন খবর পেয়ে আগেভাগেই পুকুর ঘাটে হাজির! ভাবটা এমন যেন সে কাজে এসেছিল! আমাকে দেখে অগত্যা চলে যেতে হচ্ছে! আমি মাদরাসায় যাচ্ছি, সেও নিজের মনে স্কুলে যাচ্ছে। যেন আচমকা দেখা হয়ে গেছে! সে জিব কেটে লজ্জা পাওয়ার ভান করে সরে গেছে! প্রথম প্রথম এসব দেখলেও কিছু মনে হতো না। সে আমার অনেক ছোট। তাকে সহ বাড়ির সবাইকে আমি পড়িয়েছি। পড়া না পারলে বেদম পিটুনি দিয়েছি। সে দাদুর কাছে গিয়ে নালিশ করেছে! একবার আম্মুকে বলে আমাকে মার খাওয়ার ব্যবস্থাও করেছিল!

আমি যেবার বড় হুজুরকে দিয়ে পর্দার ওয়াজ করালাম, তারপর থেকেই শিউলির কিছুটা পরিবর্তন শুরু হয়েছে। সে সত্যি সত্যি পর্দা শুরুকরেছে। পর্দা করেই স্কুলে যাওয়াশুরু করেছে। পরের দিকে আমি আপত্তি করায় স্কুলে যাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছে। বাড়িতে পড়েই পরীক্ষা দেবে। স্কুলে পুরুষ শিক্ষকের কাছে পড়া হারাম। এটা দাদাজানকে বুঝিয়ে বলায় তিনি নাতনির স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। বাড়িতেই পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

* * *

দাদু রাতে চোখে কম দেখেন। শিউলি আমার কাছে এসেছে, সেটা তিনি খেয়াল করলেন না। বুদ্ধি করে ছোট ভাইটাকেও নিয়ে এসছে। আমি তাকে বললাম:

-শিউলি! তোর এখানে আসা ঠিক হয়নি।

-আমি শুধু একটা কথা বলতে এসেছি! আর আমার আম্মুকে বলে এসেছি। চাচিকেও বলেছি। আপনার সাথে আমার একটু কথা আছে। তিনিই বোরকা পরে আসার পরামর্শ দিয়েছেন।

-কী কথা?

-আমি এই বিয়েতে রাজি নই! আরও পড়তে চাই! আর এখনই বিয়ে হোক, এটা আমি চাই না!

-একথা আমাকে বলে কী লাভ! আর তুই এখান থেকে চলে যা! এভাবে কথা বলা গুনাহ!

-আমি চলে যাব! আমি নিজের কথা বলার মতো আপনি ছাড়া আর কেউ নেই! কেউ আমার কথা শুনবে না!

-না শুনলে আর কী করবি?এখন সবকিছু ঠিকঠাক, বিয়ের মাত্র দুদিন বাকি!বিয়ে ফেরানোর সময় নেই! একবার বিয়ে ভেঙে গেলে গ্রামে সহজে দ্বিতীয়বার পাত্র পেতে সমস্যা হয়!

-আমি এবাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাই না!

-আইবুড়ি হয়ে থাকবি?

-আইবুড়ি হব কেন? এবাড়িতে পাত্রের কি অভাব আছে? এ বাড়ির কেউ যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি না হয়, আমি চিরকুমারী থাকব!

-বেশ পেকে গেছিস দেখছি! ওই যে ওখানে দাদুকে গিয়ে বল!

-আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।আর এখনো আপনি আমাকে সেই কচি খুকি মনে করেন, না!

-তবে কি তুই বুড়ি?

-বুড়ি না কি সেটা কি আপনি কখনো খেয়াল করেছেন? আপনি তো আপনার পর্দা নিয়েই আছেন!

-যাক, তুই যে জন্য আমার কাছে এসেছিস, সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়!

- এই আপনার শেষ কথা!

-শেষ আর শুরু কি রে! তোর সাথে এব্যাপারে আমার কোনো কথাই নেই! যা ভাগ! বসে বসে নতুন জামাইয়ের কথা ভাব গিয়ে!

* * *

আমি নিজেই উঠে চলে এলাম। মনটা কেমন করতে লাগল। বোকা মেয়েটা এমন ভুল কখন করল! তার সাথে তো আমার ভালো করে কথাও হয়নি কখনো। আমার কাছে পড়ত এটুকুই! অবশ্য আমি মাদরাসায় যাওয়ার আগেই বোধহয় ওর মনে যা গাঁথার গেঁথে গেছে! আজ সেটা প্রকাশ ঘটেছে! রাতে ঘুম হলো না ভালো করে। খালি মনে লাগল, মেয়েটা অসহায়! তাকে বাঁচানোর জন্যে কিছু একটা করি। কত ভরসা করে আমার কাছে এসেছে! পরক্ষণেই চিন্তাটাকে নাকচ করে দিই! এখন এসব তামাশা করার সময় নেই। তাকদীরে যা আছে, সেটাই হবে। এবাড়ির মেয়েদের একটু তাড়াতাড়িই বিয়ে হয়। ওর ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম কিছু হচ্ছে না। পাত্র ছেলেটাও বেশ ভালো। সমস্যা বলতে সে বিদেশ থাকে। দেশের পাত্র হলে ভালো হতো। বিয়ের পর নতুন বউ রেখে বিদেশ চলে যাবে! এদিকে বউ একাকী গুমরে গুমরে মরবে! অমানবিক!

* * *

যতই সময় কাটছিল আমার অস্থিরতা বেড়ে চলছিল! কাজেকর্মে শিথিলতা দেখা দিতে শুরু করল। ওদিকে ঘরে তার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু জ্যাঠামিয়াঁর কঠোর ধমকে সবকিছু ঠিকঠাক মতো চলতে লাগল। শিউলিকে কড়া পাহারায় রাখা হয়। উল্টোপাল্টা কিছু যাতে করতে না পারে! বিয়ে হয়ে গেল। একবার সে কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে গেল। আমি নির্বিকারচিত্তে সব কাজ শেষ করে, বধূ-বরের গাড়ি বিদায় করেই মাদরাসায় চলে এসেছি। আর এক মুহূর্তও বাড়িতে মন টিকছিল না। চারদিকটা কেমন খাঁ খাঁ করছিল!

* * *

আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল বিয়ের আগের রাতে। যথারীতি দাদাজির খাটে শুয়ে ছিলাম। ওপাশে খোলা জানালা। চাঁদের আলোয় চারদিক ফকফকা। দূরে ফসলের মাঠ দেখা যাচ্ছে। বাতাসে দোল খাচ্ছে ধানের শিষ। আনমনা হয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম। খুট করে আওয়াজ হলো। জানালার আড়াল থেকে খোদ জ্যাঠিমার গলার আওয়াজ ভেসে এল:

-আবদুল্লাহ! তোর সাথে শিউলি একটু কথা বলতে চায়! তুই একাকী ওর সাথে কথা বলবি না, তাই আমাকে সাথে নিয়ে এসেছে! কোত্থেকে আজব এক পর্দা না কী নিয়ে এসেছিস! আমি তোকে মায়ের মতো কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি, সেই আমার সাথেও তুই চোখ দেখাদেখি বন্ধ করে দিয়েছিস!

-মায়ের মতো কেন, আপনি আমার মা-ই! বড় মা! কিন্তু আসলে হয়েছেকি, আমাদের মাদরাসার হুজুররা সবসময় পর্দা করার কথা বলেন। কুরআন-হাদীসের কথা মানতে বলেন। আমি কীভাবে তাদের কথা অমান্য করি বলুন? আপনি কি চান আপনার ছেলে কুরআন-হাদীস বিরোধী কাজ করুক?

- না না, বাবা ঠিক আছে। তুই লেখাপড়া শিখছিস। যেটা ভালো হয়, সেটাই করবি! এখন আমার মেয়েটাকে একটু বাঁচা!

-তাকে আমি বাঁচাবার কে! আল্লাহ তা'আলাই সবাইকে বাঁচাবেন! বড়মা, তাকে বলুন, মুরুব্বিদের কথা মেনে নিতে। সব ঠিক হয়ে যাবে। এর ব্যতিক্রম হলে চিন্তা করে দেখুন, কতদিকে সমস্যা ডালপালা মেলবে।

-কিন্তু ওর যে ইচ্ছা, একজন কুরআনের হাফেযকে বিয়ে করবে! যার সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছে, সে হাফেয হওয়া তো দূরের কথা, ধর্মীয় শিক্ষা আছে কি না, তাও জানা নেই। শুধু আছে একগাদা টাকা! সেটা দেখেই তোর জ্যাঠা উঠেপড়ে লেগেছে!

-এসব আপনি আগে বলেননি কেন!

-আমার কথার দাম এই ঘরে কেউ দেয়!আমার কলিজার টুকরা মেয়েটার মতামতের মূল্য কেউ দিচ্ছে?বাবা রে, তুই একটু সাহস করলেই আমার মেয়েটার আশা পূর্ণ হয়! আমিও কত আশায় বুক বেঁধে রেখেছিলাম! তুই হাফেয হতে পারলে, তোকে আমার সবকিছু দিয়ে দেয়ারও ঘোষণা দিয়েছিলাম! শুধু আমার আদরের মেয়েটার মুখ চেয়ে! সব ওলট-পালট হয়ে গেল রে! এখন আমি কী করি! কার কাছে যাই! মেয়েটাকে কীভাবে বাঁচাই!

-বড়মা,আপনি এসব বলে শুধু শুধু আমার কষ্টই বাড়াচ্ছেন! আমি এখনো ছাত্র! পড়াশোনা শেষ করতে আরও বেশ কয়েক বছর বাকি! আমার ভারতে পড়তে যাওয়ার খুব ইচ্ছে! দেওবন্দে!

-বাবা, তুই একটু হিম্মত কর না! বাকিটুকু আমিই সামাল দিতে পারব! তুই ভারত কেন, আরও কোথাও যেতে চাইলেও আমি টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে দিতে পারব! আমি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান! বাজানের সব সম্পত্তির মালিক আমিই হব! আমার অনেক গয়না আছে! তুই যত লেখাপড়া করতে চাস, খরচাপাতির সমস্যা হবে না। আমার যা আছে, সেটা দিয়েই তুই সারাজীবন পায়ের ওপর পা তুলে খেতে পারবি! আমার মা'টার দিকে তুই একটু মুখ তুলে তাকা!

-বড়মা! আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন না!

-সেটা বলতে কি আর কিছু বাকি রেখেছি রে! গায়ে হাত তোলাটাই বাকি আছে শুধু! হতচ্ছাড়ি পোড়াকপালি যে পাথরে মাথা কুটে মরতে যাবে, আমি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারিনি! আগে বুঝতে পারিনি, ছোটবেলা থেকেই ও তোর ভক্ত! তোর কাছে লেখাপড়া শিখেছে! তোর হাত ধরে পুকুরে গেছে! মাঠে খেলতে গেছে! স্কুলে গেছে! তখনো কিছু প্রকাশ পায়নি! তখন ছোট ছিল, বেশি কিছু বুঝতও না! তোরা যেদিন মাদরাসা থেকে 'শবিনা খতম' পড়তে এলি, তারপর থেকেই ওর বোলভাল বদলে যেতে শুরু করেছে! আমরা ঘুমিয়ে পড়লেও, সে সারারাত জেগে তোর কুরআন তেলাওয়াত শুনেছে। বসে বসে কুরআন শরীফ খুলে তুই আটকাস কি না, ভুল পড়িস কি না, ধরার চেষ্টা করেছে! একটু পর পর তোদের চা করে খাইয়েছে!পান সাজিয়ে দিয়েছে! নাশতা বানিয়েছে! কেউ তাকে এসব করতে বলেনি, নিজে থেকেই যেচে করেছে!

* * *

সকালে আমি ঘুম থেকে উঠলে বলে কি, সেও হাফেয হবে! আর স্কুলে পড়বে না! তোর কাছেই হাফেয হবে! এমনকি তোকে বিয়ে করে হলেও! যাক এসব অনেক আগের কথা! শোন পাগলিটার কথা! আরও কতকি বলেছে!

-আপনি আমাকে এসব আগে বলেননি কেন!

-বলার জন্যে তোকে পেলাম কই! তুই যে হারে পর্দা করা শুরু করে দিয়েছিস! বাড়িতে এলে কোনো দিকে তোর চোখ-কান যায়! তুই তো সারাক্ষণ কাচারি ঘরে আর মসজিদেই পড়ে থাকিস!বাড়িতে থাকলে দাদাজির সাথে লেপ্টে থাকিস! এই এখনো কি তোকে পাচ্ছি! কত কায়দা-কসরত করে, পুকুর পাড় ডিঙিয়ে গোয়াল ঘরের ভেতর দিয়ে আছাড়-উষ্টা খেয়ে তারপর এই জানালার ধারে পৌছতে পেরেছি!ঘর দিয়ে আসা নিরাপদ ছিল না। আম্মা বসে আছেন এ ঘরে!শিউলিই আমাকে এ পথ চিনিয়েছে! সে নাকি প্রায়ই তোকে দেখতে আসে! তোর সাথে কথা বলতে আসে! একজন মা কতটা অসহায় হলে এভাবে আসে, তুই সেটা এখন বুঝবি না! নিজের কখনো সন্তান হলে তখন বুঝতে পারবি।

-এতকিছু হয়ে গেল, কই কোনোদিন টের পেলাম না যে! সে কখন আসত কখন যেত! আশ্চর্য! এ যে জ্বিনকেও হার মানাবে!

-ওই আসা পর্যন্তই! এর বেশি আগে বাড়তে সাহস করতে পারেনি! তুই যদি চেঁচিয়ে উঠিস? তুই সারাক্ষণ ওকে বেতের ডগায় রাখতি কি না! তার

ভয় এখনো কাটেনি! গতকালও বুকে সাহস ভরে মরিয়া হয়ে তোর কাছে এসেছিল! তুই নাকি ওকে 'যা ভাগ' বলে তাড়িয়ে দিয়েছিস! মেয়েটা আমার সেই থেকে কিছুই মুখে দিচ্ছে না!

-আমি আসলে মুরুব্বিদের ডিঙিয়ে কিছু করতে পারব না। করা উচিতও হবে না! ভুল হলে আমাকে মাফ করে দেবেন! দাদাজান এসেছেন! আপনারা ঘরে চলে যান!

* * *

এছিল সেদিনের ঘটনা। এর পরের বছর, মাদরাসার ধান কালেকশনের সময় ঘনিয়ে এল। আবদুল্লাহ ভাইকে তার এলাকা এবং তার পাশের কয়েকটা এলাকার জিম্মাদার করে পাঠানো হয়। আমি এবং আরও কয়েকজন থাকি সে দলে। থাকা-খাওয়া ভাইদের বাড়িতে হয়। সারাদিন ধান তুলে ফিরে আসি। নিজ গ্রাম শেষ। এবার অন্য এলাকায় যেতে হবে। আবদুল্লাহ ভাই মাদরাসায় থাকতেই আবেদন করেছিলেন, এবার তাকে যেন নিজ এলাকার জিম্মাদারি দেয়া না হয়। অন্য কাউকে দায়িত্বটা দিলে, কাজের কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না। তিনি সব ব্যবস্থা করে রাখবেন! আগের পরিমাণমতোই ধান উঠবে! বড় হুজুর তার কথা শুনেননি। জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পাশের এলাকায় যেদিন ধান তুলতে যাব, তার আগের দিন থেকেই আবদুল্লাহ ভাইয়ের গড়িমসি ভাব! একবার বলেন তিনি কালেকশনে যাবেন, আরেকবার বলেন যাবেন না। তাই-নাই করতে করতে, শেষ পর্যন্ত যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমাদের চাপাচাপিতে। তখনো বুঝতে পারিনি, কেন তার এই আগুপিছু ভাব! 'বায়রা' গ্রামটা এই তল্লাটের সবচেয়ে বড় গ্রাম। একটা গ্রামই যেন কয়েকটা ইউনিয়নের সমান। আগের বছরও এই এলাকায় কালেকশনের ভাগে পড়েছিলাম। তাই পথঘাট অনেকটা চেনা। একটা বাড়িতে ধান চাইতে গেলাম। বেশ অবস্থাপন্ন ঘর। গ্রামে তখন দালানকোঠা ছিল না বললেই চলে। এবাড়িতে একটাই ঘর! ঘাটায় কাচারি বাড়ি। বিরাট শানবাঁধানো পুকুর। এধরনের বাড়িতে গেলে সাধারণত ফল হয় দু-ধরনের। হয় অনেক বেশি ধান পাওয়া যায়, নতুবা কিছুই পাওয়া যায় না। আশা ও ভয়ে দুরুদুরু বক্ষে আল্লাহর ওয়াস্তে ধান চাইলাম। উঠোনে দুজন মহিলা বসে বসে চাটাই বানাচ্ছিলেন। একজন মধ্যবয়েসী। মাদরাসার নাম বলতেই দুজনের একজন দ্রুত আমাদের কাছে এগিয়ে এলেন! মহিলা না বলে মেয়ে বলাই

ভালো! কারণ, শাড়িতে তাকে কেন যেন একদম ছোট্ট আনাড়ি বালিকার মতো দেখাচ্ছিল। সদ্য কৈশোর পেরুনো দুরন্ত বালিকা। কী ব্যগ্র হয়ে আমাদের কাছে এলেন। কোনো ভূমিকা ছাড়াই জিজ্ঞেস করলেন:

-আবদুল্লাহ ভাই আসেননি?

-জি এসেছেন!

-কোথায়?

-আমাদের এদিকে পাঠিয়ে তিনি অন্যদিকে চলে গেছেন, সাথে আর দুজনকে নিয়ে গেছেন!

আমাদের কথা শুনে 'তার' চেহারাটা কেমন হয়ে গেল। আমাদের অপেক্ষা করতে বলে আরেক মহিলার কাছে প্রজাপতির মতোছুটে গেল। তাকে কী সব বলল। এবার মুরুব্বি উঠে এলেন। আমাদের পরম সমাদরে ঘরে ডেকে বসালেন। আমরা বসতে রাজি হলাম না। মাদরাসা থেকেই নিষেধ করে দেয়া হয়। এতে সময় নষ্ট হয়। আমরা ছোটরাই শুধু ভেতর বাড়িতে যাই, ধান তোলার জন্যে। অনেক সময় বিপদও হয়। তাই আগাম সতর্কতা হিশেবে কিছু নসিহত হুজুররা বিদায়ের সময় করে দিতেন। তার মধ্যে কারও ঘরে না যাওয়ার বিষয়টাও থাকত। তবে আমির সাহেবের অনুমতিক্রমে যাওয়া যেত। আমরা ঘরে বসতে ইতস্তত করছিলাম। দ্বিধা দেখে তিনি এবার ঘরের কর্তাকে ডাকলেন। একজন পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই মুরুব্বি এলেন। তিনি স্মিত হেসে বললেন:

-এটা আবদুল্লাহর বোনের শ্বশুর বাড়ি। তোমরা ঘরে এসে বসো। আমি যাচ্ছি আবদুল্লাহকে ডেকে নিয়ে আসি!

* * *

এতক্ষণে অনেক প্রশ্নের জবাব মিলল। আবদুল্লাহ ভাই কেন এগ্রামের দায়িত্ব নিতে চাচ্ছিলেন না, কেন আজ দূরে দূরে থাকছেন, সবকিছু খোলাসা হলো। আমাদের বসিয়ে রেখে মুরুব্বি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ভেবেছিলাম, অল্পবয়েসী মেয়েটা এবাড়ির মেয়ে। যেভাবে দুজন মিলে চাটাই বানাচ্ছিলেন, তাতে এমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এখন বুঝতে পারলাম ছোটজন আবদুল্লাহ ভাইয়ের বোন! একটু পর তিনি লেবুর শরবত নিয়ে এলেন। শাশুড়ি ছুটে গেলেন পাশের বাড়িতে। ডাব পাড়ার জন্যে কাউকে ডেকে আনবেন! অতি সমাদরের সাথে আমাদের শরবত খেতে দিলেন। এটা ওটা জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন। রাতে কোথায় থাকি, সারাদিন কীভাবে কাজ করি! আমাকে সম্বোধন করে বললেন,

আমাকে গতবছরও তাদের বাড়িতে দেখেছেন! ধান তোলার সময়। তার প্রশ্নের বহর শেষই হয় না। একবসাতেই বোধহয় হাজারটা বিষয় নিয়ে খুঁটে খুঁটে জানতে চাইলেন। বেশির ভাগই মাদরাসা নিয়ে। হেফযখানা নিয়ে। আবদুল্লাহ ভাইকে নিয়ে। আমি হাফেয একথা জানতে পেরে খুব খুশি হলেন। তিনি নিজে নিজে হেফয শুরু করেছেন বলেও জানালেন। কথা বলতে বলতে সাইকেল নিয়ে মুরুব্বি হাজির। সাথে আবদুল্লাহ ভাই। তাদের গলার আওয়াজ পেয়ে বালিকাবধূ ছুটে ভেতরে চলে গেলেন। আমরা তো অবাক! ভাই হলে ছুটে পালাবেন কেন?

আবদুল্লাহ ভাই এসে একটু বসেই মুরুব্বির কাছে ওঠার অনুমতি চাইলেন। বললেন, আরেকদিন এসে বেড়িয়ে যাবেন। আজ কাজ আছে। ছুটি শেষ হয়ে যাচ্ছে, এখনো বেশ কিছু এলাকায় ধান তোলা বাকি। দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে।

-আচ্ছা ঠিক আছে! তোমরা একটু বসো, আমি বউমার সাথে কথা বলে আসি!

একটু পর তিনি এসে বললেন, তোমরা যেখানেই যাও, আজ দুপুরে এখানে খেতে হবে। আবদুল্লাহ ভাই বিনয়ের সাথে দৃঢ়ভাবে অপারগতার কথা জানালেন। তখন পর্দার ওপাশ থেকে প্রথমে মুরুব্বি মহিলা কথা বলে উঠলেন। আবদুল্লাহ ভাই অস্বীকৃতি জানালেন। তখন বোন মুখ খুললেন:

-ভাইয়া, আজ দুপুরে এখানেই খাবেন!বিকেল হলেও সমস্যা নেই। আমরা না খেয়ে বসে থাকব! আপনারা আসার আগে আমরা খাব না! সে আজকে আসুন আর কাল আসুন!

* * *

আবদুল্লাহ ভাই পেরেশান হয়ে গেলেন। তার চেহারার গভীর বেদনার ছাপ ফুটে উঠল। কারণ, বালিকাবধূর শেষের কথাগুলো ছিল কান্নাভেজা। আবদুল্লাহ ভাই 'ঠিক আছে' বলে বেরিয়ে এলেন। আমরাও পিছু পিছু। তালই সাহেবও আমাদের সাথে সাথে এলেন। আমাদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিজেই ধান উঠিয়ে দিলেন। কয়েক বাড়ি থেকেই অনেক বেশি ধান উঠল। সাধারণত অনেক বাড়ি ঘুরে 'একআড়ি' ধান পাই, আজ প্রায় বেশ কয়েকটা বাড়ি থেকেই আলাদা আলাদা আড়ি উঠেছে। মুরুব্বি সবাইকে বলেছেন, তার বউমার ভাইয়ের মাদরাসা। বেশ আগ্রহ করেই ধান দিয়েছেন প্রতিবেশীরা।

* * *

জানতে পারলাম, এবাড়ির বউমা আবদুল্লাহ ভাইয়ের ছোট বোন। জ্যাঠাতো বোন। তার স্বামী বিদেশ থাকে। অল্প কদিন আগে বিয়ে করে ফিরে গিয়েছেন। ধান বিক্রি করে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। কুটুমবাড়ি পৌঁছলাম ইশার সময়। নামাজ পড়ে খেতে বসলাম। বিশাল আয়োজন দেখে আমাদের চোখ ছানাবড়া! নতুন জামাইকেও শ্বশুরবাড়িতে এত পদ দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় কি না সন্দেহ! বুঝতে পারলাম বুড়ো-বুড়ি তাদের বউমাকে বেশ ভালোই পছন্দ করেন। এবং ছেলের শ্বশুরবাড়ির লোকদেরও যথেষ্ট সমাদর করেন। এবার বিদায়ের পালা। বাড়ির লোকজন কিছুতেই আমাদের ছাড়বেন না। এদিকে আবদুল্লাহ ভাইও গোঁ ধরে আছেন, কিছুতেই থাকবেন না। মান-অভিমান হলো, কান্নাকাটি হলো, কিন্তু ভাইয়ের মন ভিজল না। আমাদের ছোট দুজনকে ভেতরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো। দুজনের হাতেই একশ টাকার নোট গুঁজে দিলেন তিনি। বুঝতে পারলাম, তিনি বধূ হিশেবে বালিকা হলেও, তার কলিজাটা বেশ সাবালিকা! সেসময়ের একশ টাকা মানে, এখনকার অনেক টাকা। দুটি মহিলা আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। পিঠ চাপড়ে আবার আসতে বললেন। নিজের ঘর মনে করে। আমরা ফিরে এলাম। পেছনে রেখে এলাম আঁসু ভরা দুটি সজল চোখ!

* * *

আবদুল্লাহ ভাই, পরে আরেকটা ঘটনা বলেছিলেন।

-শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার আগে মেয়েরা মুরুব্বিদের পা ধরে সালাম করে যায়। আমি কঠোরভাবে এটার বিরোধিতা করতাম। কিন্তু বন্ধ করতে বেগ পেতে হচ্ছিল। শিউলি এমন বিপর্যস্ত অবস্থাতেও একটা বায়না ধরল, আমাকে সালাম করা ছাড়া সে রিকশায় উঠবে না। সাফ নিষেধ করে দিলাম। এমনিতে তটস্থ হয়ে আছি! কখন কী ঘটে! সালাম করতে এসে না জানি বেয়াড়া কোনো আচরণ করে বসে! প্রস্তাবটা নিয়ে এসেছেন আমার আম্মু! আমি এককথায় বলে দিলাম:

-এসব চলবে না।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! আমার অনুমতির তোয়াক্কা না করেই সে সামনে চলে এল। বিয়ের শাড়িতে। মুখচোখ ঢেকে! আলতা-মেহেদিরাঙা হয়ে। আম্মুর সাথে কথা বলছিলাম। কোন ফাঁকে এসে আমার পায়ের ওপর পড়ল। সালাম করবে কি, বসেই আছে। আর ওঠে না! চোখের পানিতে আমার পা ভিজিয়ে ফেলছে। আমি সরে এলাম। আম্মু ওকে ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। কষ্টের তুফান নিয়ে স্তব্ধ আমি খাটের পায়া ধরে, তাল সামলে দাঁড়িয়ে রইলাম!

* * *

ধান তোলা শেষ হলো। যথারীতি পড়াশোনা শুরু হলো পুরোদমে। আবদুল্লাহ ভাই আগে প্রতি বৃহস্পতিবারে বাড়ি যেতেন। এখন দেখি মাসের পরমাস পেরিয়ে যায়, তিনি বাড়ি যাওয়ার নামটিও মুখে আনেন না। তিনি বাড়ি না গেলে আমাদের 'মহা লস'। ঘানিভাঙা খাঁটি সরিষার তেল মাখা যাচ্ছে না। খোলার দিন শনিবার দুপুরে বাড়ি থেকে রান্না করে আনা বড় বড় পেটির মাছের টুকরা পাতে উঠছে না। নানারকমের পিঠাপুলি খাওয়া যাচ্ছে না। সর্বোপরি মজার মজার গল্পও শোনা যাচ্ছে না। তিনি বাড়ি যাওয়া মানেই, শনিবারে বিশাল খাবারের একটা বহর আমাদের জন্যে বরাদ্দ হয়ে যাওয়া। বাড়ির বাগানের কলাটা, মুলোটা, আম-জাম-কাঁঠাল-লিচু কী ছিল না তাদের বাড়িতে! আমাদের ওপর জুলুম আল্লাহ তা'আলা সহ্য করলেন না। আমরা বড় হুজুরকে এটা সেটা বলে বুঝ দিয়ে, তাকে বাড়ি যেতে বাধ্য করলাম! কিন্তু বাড়া ভাতে ছাই ঢেলে তিনি সেই আগের মতো বৃহস্পতিবার রাতেই ফিরে এলেন।

-কী রে কী হলো! যেতে না যেতেই ফিরে এলেন যে?

-যে ভয়ে এতদিন বাড়ি যাইনি, ঠিক সেটাই ঘটেছে! শিউলি বাপের বাড়িতে নাইওর এসেছে! একথা শুনে আমি আর ঘরেও ঢুকিনি, বাড়ির দরজা থেকেই ফিরে এসেছি!

* * *

বছরটা শেষ হলো। রমযান এসে গেল। মাদরাসা লম্বা ছুটি। বিদায় নিয়ে যে যার বাড়িতে! ঈদের পর সবাই এসেছি!শুধু একজন বাদে। আবদুল্লাহ ভাই! লোক মারফত উড়োখবর পেলাম, তিনি বাড়ির কাছের মাদরাসায় আর পড়বেন না। দূরের কোনো মাদরাসায় পড়বেন। সেটাই ছিল তার সম্পর্কে পাওয়া শেষ খবর। একে একে অনেকগুলো বসন্ত পার হয়ে গেল। দীর্ঘদিন পর এই আজ দেখা মিলল। আমি খলবলিয়ে উঠে বললাম:

-আবদুল্লাহ ভাই! তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, আমাদের একশ টাকা করে হাদিয়া দেয়া সেই শিউলি আপুই আমাদের আজকের ভাবি?

-ঠিক ধরেছ!

-কীভাবে! কী করে হলো এ অসম্ভব কাজ! আরেকজনের বউ ভাগিয়ে আনেননি এটা হলফ করে বলতে পারি! আপনি ফরজ তরক তো দূরের কথা, সামান্য সুন্নতও যে ছেড়ে দেন না, এটা সেই ছাত্রজীবনেই দেখেছি! আপনার এখনকার নিষ্পাপ চেহারা দেখেও মন সেই আগের সাক্ষ্য-ই দিচ্ছে!

-তুমি বাড়িয়ে বলছ! আমি এতটা ভালো এখনো হতে পারিনি! আমি একজন ভিতু মানুষ!

-ভালো মানুষ হতে পারেননি, এটা ডাহা মিথ্যা কথা! তবে আপনি একজন মহা ভিতু, এটা নির্জলা সত্য!

তিনি সেই আগের মতো দরাজ গলায় হেসে পিঠ চাপড়ে দিলেন।

-তুমিও আমাকে ভিতু বললে?

আমি পিঠের ব্যথা সামলে কাতর ধ্বনিতে বললাম:

-কেন কেন?আরও কেউ বলে বুঝি? আচ্ছা, হাতে একদম সময় নেই! নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরের মতো এককথায় বলুন তো, 'পরস্ত্রী' কীভাবে 'নিজস্ত্রী' হইল!

-কিসসা বড়ই মুখতাসার! আমি সেবছর তোমাদের ছেড়ে হাটহাজারী চলে গেলাম। নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে। আমার বোনটাকেও বাঁচাতে!বছরে একবার বাড়ি আসতাম! আসার আগে খবর নিতাম, ও আছে কি না। থাকলে তাবলীগে চলে যেতাম! সে চলে গেলে তারপর আসতাম!

আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে আসতে লাগল। আসলে সমস্যা কখনোই ছিল না। শিউলিও তার স্বামীর সাথে কোনো দ্বিচার করেনি। আমার সাথে তো তার দেখাই হয়নি। সে মন-প্রাণ সঁপেই ওবাড়িতে ছিল। শ্বশুর-শাশুড়িকে মা-বাবার মতো জ্ঞান করত। তাদের সাথে মিলেমিশে থাকত! স্বামীর সাথেও তার গভীর সম্পর্ক ছিল।কিন্তু তাকদীরের ফয়সালা! বিদেশের সেই সুস্থ-সবল মানুষটা একদিন ফট করে মরে গেল। আমি জানতেও পারলাম না। অকালে বিধবা হয়ে শিউলি বাপের বাড়িতে আছে। সাথে একটা বাচ্চা! বাড়ির সবার নয়নের মণি হয়ে উঠল ছোট্ট শিশুটা! শিউলি কেমন যেন হয়ে গেল! খাওয়া-দাওয়ার কোনো বালাই নেই। ঘুম-বিশ্রামের ঠিক ঠিকানা নেই। এদিকে এতকিছু ঘটে গেল, আমি জানি না। দাওরার বছর সালানা ইমতেহান দিয়ে বাড়ি এলাম। আমার জানা ছিল না, শিউলি আছে! জিনিসপত্র রেখে, আম্মুর সাথে দেখা করতে গেলাম। তার কোলে ফুটফুটে এক শিশু!

-এটা কে আম্মু?

-ও তুই তো জানিস না! এ হলো তোর ভাগ্নে! মানে শিউলির ছেলে!

-বা রে, শিউলির ছেলে হলো কবে! দেখি আমাকে দিন! কোলে নিই!

* * *

শিউলি আছে জেনে আগের মতো আর ভয় পেলাম না। ছেলে হয়েছে। স্বামী-সংসার আছে। আর কী চাই! তারাবির নামাজ আমাদের ঘাটার মসজিদেই পড়াই সাধারণত। দাদাজির কড়া আদেশ! হেরফের হওয়ার জো নেই। ছোটখাটো একটা মাদরাসাও হয়েছে বাড়ির দরজায়। রমযানের আগের ক'টা দিন তাবলীগে সময় লাগানোর জন্যে ঢাকায় আসবঠিক করলাম! সকালের উপকূলে টিকেট কেটে রেখেছি! তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার বন্দোবস্ত করছি! এমনিতে প্রতিদিন দাদুর সাথে গল্প করি। দাদাজিকে বিভিন্ন ঘটনা পড়ে শোনাই। বাড়ির মহিলাদের পর্দার এপাশে থেকে তালিম করি। এটা অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। আমি বাড়ি এলেই তালিম হয়। এতে অনেক উপকার হয়। বাড়ির পরিবেশে এক ধরনের দ্বীনি ভাব আসে!

আজ আর তালিম করলাম না। ভোরে উঠে স্টেশনে যেতে হবে। ফজরের আগেই। বিছানা গা এলিয়ে দিয়েছি। দরজাটা অল্প করে ভেজানো।

-ভাইয়া!

আমি ভীষণ চমকে উঠলাম। কত কতকাল পর এগলা শুনতে পেলাম। গলাখাঁকারি দিয়ে বললাম:

-কে শিউলি নাকি! কেমন আছিস!

-কেমন আছি, সেটা জানতে আপনার বয়েই গেছে! শুনলাম আপনি ঢাকা যাচ্ছেন!

-জি।

-আমার কিছু জিনিস দরকার ছিল!

-বলে ফেল!

-একটা হাফেজী কুরআন শরীফ লাগবে!

-আর?

-সালমানের আব্বু আমার কুরআন পড়ার আগ্রহ দেখে, এক সেট কুরআন শরীফ পাঠিয়েছিলেন। মক্কা শরীফের ইমাম সাহেবের তেলাওয়াত!পুরো ত্রিশ পারাই আছে। তিনি সাথে একটা ভালো টেপও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু যে লোককে দিয়ে পাঠিয়েছেন, তিনি কুরআন শরীফটা দিয়ে গেছেন। টেপটা দেননি। আমার জন্যে ভালো একটা টেপ আনতে পারবেন?

-পারবেন মানে কি? অবশ্যই আনব! আর কিছু লাগবে?

-নাহ, অনেক কিছুরই তো প্রয়োজন! আপাতত কুরআন দিয়েই না হয় শুরু হোক!

-তুই দেখি কথাবার্তায় বেশ পেকেছিস!

-সবকিছুই একসময় পাকে! আপনাকেই একমাত্র সেই আগের মতো কাঁচা থেকে যেতে দেখলাম!

* * *

এরপর আরকি! সবকিছু কায়দামতোই ঘটল। শিউলি দাদার কাছে আবদার করল, সে হাফেয হবে। প্রায় অর্ধেকের মতো মুখস্থও করেছে। কিন্তু মক্কা শরীফের ইমাম সাহেবের তেলাওয়াত শুনে তার মনে হচ্ছে, পড়া শুদ্ধ নেই। সে শুনেছে, চট্টগ্রামে কোথায় যেন মেয়েদের মাদরাসা হয়েছে। সেখানে সে ভর্তি হতে চায়। দাদাজি সবাইকে নিয়ে বসলেন। সবার এক কথা, ছোট্ট বাচ্চা রেখে মাদরাসায় ভর্তি করা যৌক্তিক হবে না। কিন্তু তার আগ্রহ দমিয়ে দেয়াও ঠিক হবে না।

ছোট চাচি একটা প্রস্তাব দিলেন:

-আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে! একটা কাজ করা যেতে পারে, মেয়েটাকে এতদূরে পাঠাতে হবে না। এখানেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে!

-কীভাবে?

-ওকে কোনো হাফেযের সাথে বিয়ে দেয়া যেতে পারে!

-স্বামীহারা সন্তানধারিণী বিধবা মেয়েকে কে বিয়ে করবে?

-খোঁজ করে দেখতে ক্ষতি নেই! আর বিয়ে হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের আবদুল্লাহর কাছেই না হয় পড়বে!

দুষ্টু চাচির মুখে আমার নাম শোনার সাথে সাথেই সবার টনক নড়ল। যেন কল্পনাতীত, সমাধানের অতীত কোনো সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছে! তাই তো! তাই তো! এমনটা হতে পারে! দাদাজি বললেন:

-ঠিক আছে, আমি আবদুল্লাহকে বলে দেব!

চাচি আবার মুখ খুললেন:

-মনে হয় না, সে প্রস্তাবটা মেনে নেবে! সে পর্দার দোহাই তুলে পাশ কাটিয়ে যাবে!

-তাহলে?

-সে যাতে পর্দার অজুহাত তুলতে না পারে, সেজন্য পর্দাটাই উঠিয়ে ফেলা যায় কি না, সেটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে!

দাদাজির মুখে হাসি খেলে গেল। বৈঠক থেকে উঠে বড়ঘরের দিকে যেতে যেতে মন্তব্য করলেন:

-বৌমার মাথায় বুদ্ধি বেশ ভালো খেলে দেখছি!

* * *

সবাই এমন করে ধরল। না বলার উপায় আছে? তার ওপর সালমান ভাগ্নেকে আমার দুয়েক দিনেই এত ভালো লেগে গেল, কাছছাড়া করতে ইচ্ছে করত না। বেশ ন্যাওটা হয়ে উঠেছে। বিয়েটা হয়ে গেল। ঢাকা থেকে ফেরার পর। তাবলীগে দশদিন সময় লাগানোর ইচ্ছে ছিল। সেটা পাঁচদিনে কমিয়ে এনে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হলাম। সন্ধ্যায় পৌছলাম। সবকিছু আগেই ঠিকঠাক ছিল। রাতেই বিয়ে হয়ে গেল। সবাই জোর-জবরদস্তি করে বাসর ঘরে ঢুকিয়ে দিল। সবকিছু স্বপ্নের মতো দ্রুতলয়ে ঘটে চলছিল। আমি ঘোরের মধ্যেই কামরায় প্রবেশ করলাম। সালাম দিলাম। শিউলি উত্তর দেবে কি, উল্টো হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে বলল:

-কেমন জব্দ হলেন?

আমি বললাম:

-চালটা তো বেশ ভালোই দিয়েছ!

-কেন আপনি খুশি নন এবিয়েতে?

-আমি কি সেটা বলেছি?

-তো কি! ভিতুদের জোর করে সাহসী করে না তুললে, কাজ চলে না। এমনিতেই ভিতুরা চিরকাল অনেক কিছু হারায়!

-একথা কেন বললে? তারা কী হারায়?

-এই দেখুন না, চাইলেই যেখানে সম্পূর্ণ আনকোরা তরতাজা উর্বর নতুন জমিতে নিজের মতো করে চাষ করা সম্ভব ছিল, অফুরন্ত সুযোগ ছিল, সেখানে ভিতু হওয়ার কারণে আরেকজনের লাঙল দেয়া জমিতে চাষ করতে হচ্ছে! তাজা ফুল শোঁকার উপায় ছিল, এখন শুঁকতে হচ্ছে বাসি ফুল! তবে কথা দিচ্ছি, ফুল বাসি হলেও, ঘ্রাণ সেই আগের মতোই মনকাড়া আছে! জমির উর্বরতাও কমেনি।

জীবন জাগার গল্প: ৬৮২

দাদু নাতনিকে!

মেয়ে বিদায় হয়ে যাবে। নিজের কারও মেয়ের চেয়ে, একজনের স্ত্রী, এই পরিচয়টাই বড় হয়ে উঠবে। তার এই নতুন ভূমিকাটা যেন সুন্দর হয়, মসৃণ হয়, এজন্য মায়ের চিন্তার অন্ত নেই। শাশুড়ির সাথে পরামর্শ করলেন। কিছু কথা মেয়েকে বলে দেয়া দরকার! না হলে পদে পদে হোঁচট খাবে! নিজে বলতে একটু সংকোচ লাগছে! তাই শাশুড়িকেই বলতে অনুরোধ করলেন! নাতনির সাথে সম্পর্কটাও বেশ ভালো!

* * *

দাদু ডেকে পাঠালেন নাতনিকে। উভয়ের মন খারাপ। বরের বাড়ি অনেক দূরে। অবস্থাপন্ন পরিবার। খেত-খামার আছে। গরু-গোতান আছে। সব দেখেশুনে রাখতে হবে। স্বামীকেও সুখী করতে হবে! দাদু সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন:

-বোন! তুই নতুন আরেকটা জীবনে পদার্পণ করতে যাচ্ছিস! তোকে কয়েকটা কথা বলে দিচ্ছি। ঠিকঠাক মেনে চলতে পারলে, সংসারে সুখের বান ডাকবে!

-দাদু, আপনি বলুন! আমি অবশ্যই সেগুলো মেনে চলব!

-তাহলে শোন!

১. অল্পেতুষ্ট থাকার মনোভাব নিয়ে, স্বামীর কথা মেনে চলবি। স্বামীর কাছে বারবার একই জিনিস চাইবি না। আর খুব বেশি প্রয়োজন না হলে, কিছু না চাওয়াই ভালো।

২. স্বামী তোকে কথা বললে, খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনবি! তার কথার মাঝে কথা বলে উঠবি না। পছন্দ না হলে, পরে কখনো সুযোগমতো বলবি! সাথে সাথে মুখের ওপর উত্তর দেয়া খুবই বিপজ্জনক!

৩. স্বামীর চোখের স্থানগুলো মানে ঘরে যেসব জায়গায় স্বামীর চোখ পড়ে, সেসব জায়গা পরিপাটি করে রাখবি! বিশেষ করে বাইরে থেকে আসার পর যেন কোনো কিছু এলোমেলো না দেখে। তুই নিজেও পরিপাটি হয়ে থাকবি! যত কাজই থাকুক, স্বামীর সামনে আলুথালু বেশে যাবি না!

৪. স্বামীর নাকের স্থানগুলো মানে যেসব জায়গার গন্ধ স্বামীর নাকে যায়, সেগুলো পরিষ্কার ও দুর্গন্ধমুক্ত রাখবি। এটা অত্যন্ত জরুরি। তোর নিজের গন্ধের দিকেও খেয়াল রাখবি।

৫. তার ঘুমের সময়টাকে পরিপূর্ণ নিরিবিলি রাখবি। খুটখাট আওয়াজে যেন তার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। বাইরে গায়ে-গতরে খেটে কাজ করে। তার গভীর ঘুমের প্রয়োজন। মনে রাখবি, অনেক পরিবারে অশান্তি হয় স্বামীর ঘুমটা ভালো না হওয়ার কারণে। নির্ঘুম থাকলে মেজাজ খিটিমিটি হয়ে যায়! এর জের ধরে শুরু হয় ঝগড়া-ঝাঁটি।

৬. স্বামীর খাবারের ব্যাপারটাও অত্যন্ত গুরুত্ব দিবি। সে পেটপুরে তৃপ্তিমতো খেতে না পারলে, তার মন-মেজাজ ভালো থাকবে না। শরীফ থাকবে না। স্বামীর মনে ভালোবাসা তৈরি হয়, খাটিয়া আর পাতিলের জোরে।

৭. স্বামীর টাকা-পয়সা আগলে রাখার চেষ্টা করবি। একটা পাই-পয়সাও যেন অযথা খরচ না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবি। তোর হাতে খরচের টাকা থাকলে, যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করে খরচ করবি। স্বামীর কষ্টের দিকে খেয়াল রাখবি। বেচারা কত কষ্ট করে, কত ঘাম ঝরিয়ে পয়সা রোজগার করেছে! সম্পদ বাড়ে পরিমিত ব্যয়ে।

৮. স্বামীর আত্মীয়-স্বজনকে নিজের আত্মীয়-স্বজনের মতো মনে করবি। কাউকে হেয়-অবহেলার চোখে দেখবি না। এমন হলে তুই নিজেই কষ্ট পাবি! সম্পর্ক বাড়ে, সম্মানেআর মূল্যায়নে।

৯. স্বামীর কোনো আদেশ অমান্য করবি না। এতে তার মানে তোর প্রতি অনীহা তৈরি হবে। এটা তোদের উভয়ের জন্যেই সুখকর পরিণতি বয়ে আনবে না।

১০. গোপনে তার দোষ খুঁজে বেড়াবি না। এমনকি তার যদি কোনো গোপন দোষ থাকেও, তোর কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে, কারও কাছে ফাঁস করবি না। চেষ্টা করবি নিজেই সংশোধন করতে। তবে বুদ্ধিমত্তার সাথে।

১১. স্বামীর মন খারাপ থাকলে, তার সামনে হাসাহাসি করবি না। আনন্দ প্রকাশ করবি না। তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করবি।

১২. স্বামী আনন্দে থাকলে, নিজের দুঃখ-শোককে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করতে যাবি না।

এবারোটা কথা যদি মেনে চলতে পারিস, তোর বরটা মানুষ হলে,তুই হবি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুখী ঘরনি!

হুন্না লিবাস-বডি হিটার

বডি হিটার? স্ত্রীর ভূমিকা কী? বডি হিটিং? স্বামীর শরীর গরম করা? সোজাসাপটা উত্তর দিতে গেলে, অবলীলায় বলতে হবে:

-জি। তবে উল্টোটাও সত্যি। স্বামীর একটা ভূমিকাও তাই। স্ত্রীর বডি 'হিট' করবে। দুজনের মধ্যেই আল্লাহ হিটিং সিস্টেম ফিট করে দিয়েছেন। উঁহুঁ! এটা আমার কথা নয়।

-কার কথা?

-স্বয়ং আম্মাজান আয়েশা রা.-এর কথা। তাও যার তার সম্পর্কে নয়, খোদ নবীজি সম্পর্কে। আপনি কোথাকার এত 'রুচিবাগীশ' চলে এসেছেন! এটাকে অরুচিকর কথা বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন?

একটা গল্প শোনা যাক! গল্পটা সবার জানা। তারপরও চলুক না!

-হুযুর ওয়াজ করতে গিয়েছেন। গ্রামে। ধানি ফসল উঠেছে। মানুষের মনে সুখ। পকেটে সুখ। সুখের চোটে কেউ ওয়াজ-মাহফিল দিচ্ছে। কেউ যাত্রাপালার আয়োজন করছে। গ্রামবাসীর ইচ্ছে হলো, এবার ফসল মাশা আল্লাহ ভালোই হয়েছে। আল্লাহ-খোদার নাম না নিলে কেমন দেখায় না! একটা ওয়াজের আয়োজন করা যাক! সুরেলা একজন ওয়ায়েজ দাওয়াত দেয়া হলো। কচি বয়েসের আলেম। রক্ত গরম। গলা গরম। আরও অনেক কিছুই গরম। হুযুর মাইক পেয়ে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। দীর্ঘ এক ওয়াজ দিলেন। ওয়াজের একপর্যায়ে হুযুর বললেন:

-আপনার পাক-পবিত্রতার দিকে নজর রাখবেন। গ্রামের মানুষজন এদিকটাতে ভীষণ উদাসীন। তারা মা-বোনদের শাড়ি দিয়ে সেলাই করা 'কাঁথা' গায়ে দেয়। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এমন কাঁথা কীভাবে গায়ে দেন? এধরনের কাঁথা গায়ে দেয়া যাবে না।

* * *

ওয়াজ শেষ। গ্রামের মানুষেরা খাবারের অয়োজনে কমতি করেনি। রান্নাটাও হয়েছে মন্দ না। বেশ জমিয়ে খাওয়া গেছে। কাতলা মাছের মুড়োটা! আহ! মোরগের রানটা? লা জওয়াব! মুগ ডালের চচ্চরি? ওহ! এখনো জিবে লেগে আছে। শেষে গামছা পাতা দই? কলিজাটা মোচড় দিয়ে উঠছে! পেটে আর জায়গা ছিল না বলে। তা এত কষ্টের মধ্যে সুখ, একটা পদও 'অনাঘ্রাত' ছিল না। ঢেকুরের মধ্যে কী রকম খোশবাই ছড়াচ্ছে! আল্লাহ মালুম! অন্যকিছুও বোধহয় সুবাসিত হয়ে গেছে!

* * *

এবার শোয়ার পালা। কী নরম আর তুলতুলে বিছানা! শুলেই ঘুম চলে আসবে। এ কি! গায়ে দেয়ার যে কিছু নেই? এ কেমন বেত্তমিজি! রাজভোগের পর শরীফ মেজাজটাই খাট্টা হয়ে গেল। সভাপতি সাহেব!

-জি হুযুর!

-মাঘ মাসের এই কনকনে শীতে কি মারা পড়ব?

-কেন হুযুর, কী হয়েছে?

-আমি গায়ে দেব কী?

-ইয়ে মানে, হুযুর ওয়াজে বলেছিলেন, মেয়েছেলেদের শাড়ি দিয়ে সেলাই করা কাঁথা গায়ে পুরুষের জন্যে হারাম! তাই...!

(সবাই গল্পটার শুধু এটুকুই জানে। বাকিটা অনেকেরই জানা নেই। তাহলে গল্পের বাকি অংশ? ... চলবে)

* * *

আচ্ছা, হিটিং সিস্টেম নিয়ে আলোচনাটা আপাতত 'ফ্রিজ' করে রাখি। তার আগে শিরোনামের প্রথম অংশকে 'হিট' করা যাক।

-কুরআন কারীমে একটু পরপরই কিছু বাক্য পাওয়া যায়। এগুলো অনেকটা 'ইউনিভার্সাল ট্রুথ'-এর মতো। চিরন্তন সত্য। সর্বকালের জন্যে প্রযোজ্য। তার মানে এই নয়, অন্য অংশগুলো ব্যতিক্রম। কুরআন কারীম অতি অল্পকথায় অনেক বড় বড় বক্তব্য প্রকাশ করে। দুয়েক শব্দেই বিরাট বিরাট মূলনীতি দাঁড় করিয়ে দেয়। তেমনি দুটি বাক্য হলো :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ

তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের জন্যে পোশাক। আবরণস্বরূপ।

أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

তোমরা (স্বামীরা) তাদের জন্যে পোশাক। আবরণস্বরূপ।

* * *

মাত্র কয়েকটা শব্দে কুরআন কারীম পুরো দাম্পত্যজীবনকে জীবন্ত করে দিয়েছে। সব সমস্যার সমাধান দিয়ে দিয়েছে। সমস্ত সুখের আকরকে জীবন্ত করে দিয়েছে। কীভাবে?

এক. একে অপরের জন্যে আসলেই আবরণস্বরূপ। সুরক্ষা। পোশাক পরলে, বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। স্বামী বা স্ত্রী থাকলে, হারাম থেকে বেঁচে থাকা যায়। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়। চারিত্রিক বিচ্যুতি থেকে বেঁচে থাকা যায়। পদস্খলন থেকে বেঁচে থাকা যায়।

দুই. পোশাক পরলে, বাইরের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। রোদের উত্তাপ থেকে। শীতের প্রকোপ থেকে। সাপ-খোপ-বিচ্ছু থেকে। পোকা-মাকড়ের দংশন থেকে। স্বামীও তার স্ত্রীকে সেভাবে সবধরনের বাহ্যিক অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন। বদলোকের লোলুপতা থেকে হেফাযত করেন।

তিন. পোশাক সতর ঢেকে রাখে। লজ্জাস্থান ঢেকে রাখে। মান-সম্ভ্রম রক্ষা করে। শালীনতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। শরীরের দোষ-ত্রুটি-খুঁত লুকিয়ে রাখে। স্বামী-স্ত্রীও একে অপরের দুর্বলতাগুলো অন্যদের থেকে আড়াল করে রাখবে। আচ্ছাদন দিয়ে রাখবে।

চার. পোশাক পরলে মানুষ প্রশান্তি অনুভব করে। আরাম পায়। স্বস্তি পায়। নিরাপত্তা বোধ করে। নিশ্চিন্ত হয়। উসখুসভাব থাকে না। খুঁতখুঁতানিও থাকে না। স্বামী-স্ত্রী পাশে থাকলেও জীবনে পরম 'স্থিতি' আসে। থিতুভাব আসে।

পাঁচ. জ্ঞানীব্যক্তি মাত্রেই নিজের জন্যে উপযুক্ত পোশাক বেছে নেয়। কোন পোশাকটা নিজের জন্যে বেশি উপযুক্ত হবে, চিন্তা-ভাবনা করে। পরামর্শ করে। মার্কেটে যাওয়ার সময় সাথি-সঙ্গীদের নিয়ে যায়। যেন উপযুক্ত রংটা কেনা যায়। সঠিক কাপড়টা পাওয়া যায়। স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারটাও এমনই। উপযুক্ত মানুষটাকেই বেছে নিতে হয়। তাহলেই শান্তি।

ছয়. পোশাক মানুষকে পরিপূর্ণতা দেয়। অসম্পূর্ণতাগুলোকে ভরাট করে দেয়। স্বামী-স্ত্রীও একে অপরের অসম্পূর্ণতাগুলো দূর করে। যৌথ প্রচেষ্টায় দুজনের খামতিগুলো দূর হয়। সংসারে নানা অসংগতি থাকলেও, ঢেকেঢুকে রাখে। ঘরের কথা পরে জানতে পারে না।

সাত. সবাই নিজের জন্যে সুন্দরতম পোশাক বেছে নিতে চায়। ঝলমলে পোশাক চায়। নিখুঁত ডিজাইনের সেটটা সংগ্রহ করতে চায়। নিজের ব্যক্তিত্বের সাথে খাপ খায় এমন পোশাকটার জন্যে হন্যে হয়ে ফেরে। এদোকান সেদোকান করতে করতে পা ফুলিয়ে ফেলে। স্বামী বা স্ত্রীও তেমন 'খাপ খাওয়ানো' হওয়া উচিত।

আট. পোশাক আর শরীরের মাঝে একটা সম্পর্ক থাকে। একটা আরেকটার সাথে অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে থাকে। অপরিহার্যভাবে। অবিচ্ছেদ্যরূপে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কও তেমনি। আত্মিক। শারীরিক। আবেগের। অনুভূতির।

নয়. পোশাক আঁটসাঁট হয়ে গেলে, অনেক সময় সেটা পরেই চলাফেরা করতে হয়। প্রথম প্রথম কোনো কোনো পোশাক একটু আঁটো লাগে। বাধো বাধো ঠেকে। পরে আস্তে আস্তে সয়ে যায়। সহনীয় হয়ে আসে। স্ত্রী-স্বামীও এমনই। সহ্য করে নিতে হয়। হজম করতে হয়। কষ্ট হলেও জোর করে থাকতে হয়। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে আসে।

দশ. পোশাক আর শরীর এক হয়ে থাকে। দোঁহে মিলে। যেন দুটো মিলে এক সত্তা। এক প্রাণ। এক দেহ। স্বামী-স্ত্রীও তেমন। দুজন হলেও, থাকতে হয় এক দেহের মতো। একাকার হয়ে। একীভূত হয়ে। একে অপরের মধ্যে লীন হয়ে।

এগারো. পোশাক পরলে এক ধরনের প্রশান্তি নেমে আসে। মনে ও তনে। আরাম আরাম বোধ হতে থাকে। স্বামী-স্ত্রীও তেমনি। কাছে গেলেই ভালো লাগা শুরু হয়। আরামবোধ হতে থাকে। (سَكَنٌ) সাকান বা শান্তিবোধ হতে থাকে। কাতাদা রহ. বলেছেন: লিবাস অর্থ: সাকান। শান্তি।

বারো. পোশাক তৈরি করার পর, ডিজাইন বা সেলাই পছন্দ না হলে, পরিবর্তন করা হয়। নতুন করে সেলাই করা হয়। কুঁচি, ফুল, ভাঁজ নতুন করে দেয়া হয়। স্বামী-স্ত্রীও তেমন। সাংসারিক জীবনে একসাথে থাকতে গেলে, উভয়ের মাঝেই কিছু অভ্যেস-আচরণ ধরা পড়ে। যৌথ জিন্দেগীর জন্যে এসব অভ্যেস ক্ষতিকর। তাই এসব 'খাসিয়ত-খাসলত' পরিবর্তন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। নিজেকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

তেরো. বিপদের সময়, শীত-গ্রীষ্মে পোশাকই মানুষকে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে। প্রচণ্ড ঠান্ডার প্রকোপ, তীব্র গরমের ঝাপটা থেকে বাঁচতে মানুষ পোশাকের আশ্রয় নেয়। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতেও স্বামী-স্ত্রী একে অপরের কাছে আশ্রয় খোঁজে। সান্ত্বনা খোঁজে।

চৌদ্দ. তোমার জন্যে পোশাকস্বরূপ। তার মানে এটাই তোমার জন্যে নির্দিষ্ট। অন্য কারও চিন্তা কোরো না। অন্য কারও দিকে তাকিয়ো না। অন্য কারও দিকে উঁকি দিয়ো না। ভিন্ন কারও প্রতি প্রলুব্ধ হয়ো না। অন্য কারও প্রেমে পোড়ো না।

পনেরো. লিবাস মানে? বৈবাহিক সম্পর্ক। অর্থাৎ, পারস্পরিক বোঝাপড়া। পারস্পরিক একাত্মতা। পারস্পরিক সৌহার্দ্য। পারস্পরিক সম্প্রীতি। পারস্পরিক নির্ভরতা। পারস্পরিক সহযোগিতা। কুরআনের ভাষ্য

অনুযায়ী: পারস্পরিক (مَوَدَّةً)-মাওয়াদ্দাহ। প্রগাঢ় ভালোবাসা। পারস্পরিক (رَحْمَةً)-রহমত। হৃদ্যতা।

ষোলো. রবী বিন আনাস রহ. বলেছেন: লিবাস মানে লিহাফ। লেপ। শীতের সময় যেমন লেপ গায়ে দেয়, স্বামী-স্ত্রীও একে অপরকে গায়ে দেবে। উষ্ণতা বিলাবে।

সতেরো. পোশাক মাঝেমধ্যে খুলে রাখতে হয়। শরীর থেকে আলগা করতে হয়। দুজনের মাঝেও কখনো কখনো বাঁধন আলগা হয়ে আসে। দূরত্ব সৃষ্টি হয়। বৈরিতা তৈরি হয়। সম্পর্কটাকে ঝালাই করার প্রয়োজনেই, সংকটের সময় দুজন কিছুটা সময় আলাদা-অন্তরালে থাকা জরুরি। নতুন করে শুরুর জন্যে এটা বেশ উপযোগী।

আঠারো. লিবাস শব্দটাকে রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বাস্তবে তো স্বামী-স্ত্রী লিবাস নয়। লিবাস বলে, পোশাক যেমন শরীরের সাথে লেপ্টে থাকে, দুজনকেও এভাবে আজীবন লেপ্টে থাকার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

উনিশ. আরবী অলংকারশাস্ত্র অনুযায়ী, লিবাস শব্দটা 'একবচন'। দুজনের ক্ষেত্রেই একবচনই ব্যবহার করা হয়েছে। এবং লিবাস শব্দটার কোনো বিশেষণ ব্যবহার করা হয়নি। অর্থাৎ, কোনো বাড়তি কথা নেই। অতিরিক্ত প্রটোকল নেই। অপ্রয়োজনীয় আড় নেই। সরাসরি। স্বামী-স্ত্রীর মাঝেও কোনো আড়াল থাকবে না। প্রটোকল থাকবে না। আড়ম্বর থাকবে না। যা কিছু হবে, সব সরাসরি। ডিরেক্ট একশন।

বিশ. একে অপরের জন্যে 'লিবাস'। এখানে দুজনের সম্পর্ককে লিবাস ও শরীরের সম্পর্কের সাথে 'তুলনা' করা হয়েছে। উপমা দুই ধরনের হয়:

ক) হিসসি। স্পর্শজাত। ধরা যায়। ছোঁয়া যায়। অর্থাৎ, পোশাক যেমন শরীরকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে রাখে, আগলে রাখে, স্বামী-স্ত্রীও একে অপরকে এভাবে আগলে রাখবে।

খ) আকলি। বুদ্ধিবৃত্তিক। অনুভূতিজাত। পোশাক শুধু বাহ্যিকভাবেই নিরাপত্তা দেয় না। মানসিকভাবেও দেয়। বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে মাঠে নামা আর শুধু আটপৌরে পোশাক পরে মাঠে মানার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। দুজনের মানসিক স্থিতি-অস্থিতির মাত্রায় অনেক ফারাক। স্বামী-স্ত্রী শুধু একে অপরের জন্যে বাহ্যিক 'আবরণ'ই নয়। দুজন দুজনকে মানসিক 'সাপোর্ট'ও দেবে।

একুশ. প্রথমে স্বামীকে বলা হয়েছে: স্ত্রীরা তোমাদের জন্যে আবরণস্বরূপ। স্ত্রীদের প্রথমে তাদের স্বামীর কথা বলা হয়নি। তার মানে, একজন স্ত্রীর

জন্যে স্বামী যতটা প্রয়োজন, একজন স্বামীর জন্যে স্ত্রীর প্রয়োজন তারচেয়ে বেশি। বুড়ো বয়েসের কথা চিন্তা করলে ব্যাপারটা খোলাসা হয়ে যাবে। বুড়ো মারা গেলে, বুড়ি বাকি জীবন পার করে দিতে পারে। অতবেশি সমস্যা হয় না। কিন্তু বুড়ি মরে গেলে, বুড়োর সবদিক আঁধার হয়ে যায়। স্ত্রী ঘরে থাকে। তার পাপের আশঙ্কা কম। পাপের সুযোগ কম। স্বামী বাইরে বাইরে থাকে। তার পাপের সুযোগ বেশি। তাই তার স্ত্রীরও প্রয়োজন বেশি। আবার এটাও বলা যায়, সংসারে স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর ভূমিকাই বেশি প্রভাবশালী। সন্তান লালনপালনের দিকটা লক্ষ করলে, বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বাইশ. বৈবাহিক সম্পর্কটা শুধু বাহ্যিক রুসুম-রেওয়াজ নয়। একজন আরেকজনের পোশাক বলে বোঝানো হয়েছে, একা একা থাকা নয়, যৌথভাবে থাকাই কাম্য। তাহলে পারিবারিক বন্ধন অটুট থাকবে। অফিসিয়াল সম্পর্ক নয়। কৃত্রিম হাই-হ্যালোর সম্পর্ক নয়। আলাদা সত্তা, ব্যক্তি স্বাধীনতার চর্চা নয়। দুজনকে থাকতে হবে এক হয়ে। এটাই পোশাকের দাবি। লিবাসের নিগূঢ় মিনিং।

তেইশ. পোশাককে সুন্দর রাখতে হয়। পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। দুজনের সম্পর্ককেও তরতাজা রাখতে হয়। জীবন্ত প্রাণবন্ত রাখতে হয়। পোশাকে ময়লা-আর্বজনা যাতে না লাগে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। দুজনের সম্পর্কেও যেন আবিলতা না লাগে, সেদিকে চৌকান্না থাকতে হয়।

চব্বিশ. পোশাককে গ্রহণযোগ্য করার জন্যে সুবাস ব্যবহার করতে হয়। সুন্দর বোতাম লাগাতে হয়। দুজনের সম্পর্ককে সুন্দর করতে হলে, টেকসই করতে হলে, গ্রহণযোগ্য করতে হলেও এমন কিছু করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুন্দর কথা। ভদ্র ও সৌজন্যমূলক আচরণ দিয়ে। উপহার কিনে দিয়ে। কোথাও বেড়াতে নিয়ে গিয়ে। আদর দিয়ে। সোহাগ দিয়ে। হাসি-কৌতুক দিয়ে। আনন্দ দিয়ে। চাঁদনি রাতে দৌড় প্রতিযোগিতা করে এবং...।

পঁচিশ. পোশাক ধোয়া প্রয়োজন হয়। মাঝেমধ্যে বেশি ময়লা হয়ে গেলে, ধোপার কাছেও দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সংসারেও ময়লা জমে। কিছু ময়লা নিজেরাই ধুয়ে ফেলা যায়। কিছু ময়লা ধুতে তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়াই যুক্তিযুক্ত।

ছাব্বিশ. পোশাককে অতি যত্নের সাথে ব্যবহার করতে হয়। দুজনকে একে অপরের সাথে কোমল আচরণ করতে হয়।

সাতাশ. মেয়ের শোকাতুর বাবা-মাকে আশ্বস্ত করা হয়েছে। মেয়ে তোমাদের কাছ থেকে আরেক ঘরে গেলেও, স্বামী তাকে পোশাকের মতোই যত্ন করে রাখবে।

আটাশ. একটা চ্যালেঞ্জ এখানে দেয়া যায়, সমস্ত জ্বিন-মানব একসাথে হলেও এমন একটা ব্যাপক অর্থবহ বাক্য বানানো সম্ভব হবে কি? দাম্পত্যজীবনের সবদিককে ধারণ করতে পারে এমন?

উনত্রিশ. পোশাক পরা মানে, পোশাকের মধ্যে ঢুকে পড়া। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পোশাক মানে? একজন আরেকজনের মধ্যে ঢুকে পড়া। ভালোবাসায়। মহব্বতে। অনুরাগে। বোঝাপড়ায়। সমঝোতায়। গভীর আবেশে।

ত্রিশ. পোশাক শরীরকে তাপ দেয়। স্বামী-স্ত্রীও একে অপরকে তাপ দেয়। কীভাবে?

ইমাম বুখারী রহ.-এর গুরুস্থানীয় ব্যক্তি হলেন 'ইবনে শায়বা' রহ.। তিনি তার বিখ্যাত কিতাব *মুসান্নাফে* একটা অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন: গোসলের পর পুরুষ তার স্ত্রী থেকে উত্তাপ গ্রহণ।

ইমাম তিরমিজি রহ.-ও তার বিখ্যাত কিতাবে এমন শিরোনাম দিয়েছেন। এ-বিষয়ক হাদীস সংগ্রহ করেছেন। কিছু পড়ে নেয়া যাক।

১. আম্মাজান আয়েশা রা. বলেছেন: আল্লাহর রাসূল ফরয গোসল করার পর, আমাকে জড়িয়ে ধরে 'উত্তাপ' গ্রহণ করতেন। আমিও তাকে আমার সাথে জড়িয়ে নিতাম। আমার গোসল তখনো বাকি ছিল। এঅবস্থাতেই। (*তিরমিযি*)

২. উমর রা., ইবনে উমর রা., আবু দারদা রা., ইবনে আব্বাস রা.-ও এমন মজার ও সুখকর আমল করেছেন বলে হাদীসে আছে।

৩. ইবনে আব্বাসরা. বলেছেন: আমি ফরয গোসল করে, স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরি। সে গোসল করার আগেই।

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন: শীতকালে কুরাইশ পুরুষদের এটাই ছিল জীবনরীতি।

৪. ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন: আমি স্ত্রী থেকে শীতে উষ্ণতা গ্রহণ করি। গ্রীষ্মে শীতলতা গ্রহণ করি।

-কাপড় পরা থাকলে, উত্তাপ ভালোভাবে আসবে না। আর আম্মাজান শব্দ ব্যবহার করেছেন: (استدفاء) ইস্তেদফা'। উষ্ণতা লাভ করা। এটা কাপড় থাকলে জোরালো হয় না। চামড়ার সাথে চামড়া লাগলে যতটা হয়। হাদীসের ব্যখ্যাগ্রন্থগুলোতে এমনটাই বলা হয়েছে।

* * *

হুযুর এমনিতে গরম। সভাপতির কথা শুনে আরও গরম হয়ে গেলেন:

-আপনাদের আয়োজন দেখে তো আমি ভেবেছিলাম আপনারা বুদ্ধিমান। এখন ধারণা পুরোপুরি উল্টে গেল!

-কেন হুযুর! আমরা বোকামির কী করলাম?

-আমি কি শুধু কাঁথার ওয়াজ করেছি! এত টাকা দিয়ে ওয়াজের এন্তেজাম করেছেন! নিজেরাই যদি মনোযোগ দিয়ে ওয়াজ না শুনবেন, তাহলে এত পরিশ্রমের কী মূল্য রইল!

-হুযুর ভুল হয়ে গেছে! একটু যদি ধরিয়ে দিতেন!

-আমি স্বামী-স্ত্রীর কীভাবে সুন্নাত তরিকায় থাকবে, সে ওয়াজ করিনি! শীতকালে নবীজি কীভাবে আম্মাজানের কাছ থেকে উত্তাপ গ্রহণ করতেন সেটা খুলে বলিনি! খালি কাঁথার কথাটা মনে রাখলেন?

-সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর লাখ লাখ শোকর! হুযুরের ওয়াজ শুনে গিন্নি এত খুশি হয়েছে, আর বলার নয়। গিন্নি একটা আবদারও জুড়েছে!

-আবার কী আবদার!

-হুযুর যদি রাজি থাকেন! আমাদের 'মা' রাবিয়াকে আপনার হাতে তুলে দিতে চায়!

-ইন্নালিল্লাহ! ছিঃ ছিঃ আব্বাজান! আমি এতক্ষণ আপনার সাথে কত বেয়াদবিই না করে ফেলেছি। মাফ করে দিন!

-তাহলে কি...!

-জি জি! শুভ কাজে দেরি কেন! মাসআলা হলো : বিয়ের বয়েস হওয়ার পর, বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর দেরি করতে নেই!

জীবন জাগার গল্প : ৬৮৪

ওয়াসজুদ ওয়াকতারিব

বাবা নেই। শুধু মা আছেন। বিয়ের বয়েস হয়ে গেছে। গরিব দেখে কেউ বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না। ভাঙাচোরা ঘর। মা রাতদিন আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানিয়ে যাচ্ছেন। মেয়েটার একটা গতি হোক। আল্লাহ মায়ের কথা শুনলেন। পাশের বাড়ির এক যুবকের মনে দয়া হলো। নিজ থেকেই প্রস্তাব দিল। মায়ের মনে শঙ্কা।

–বিয়েটা আমাদের অসহায় অবস্থার দিকে চেয়ে করছ না তো বাবা!

–জি না। আমার বিয়ে করা প্রয়োজন। আপনার মেয়েটাও উপযুক্ত। বাড়ির কাছে ফুল রেখে দূরের বাগানে কেন যাব! তবে মিথ্যা বলব না, বিয়েটা হলে আপনাদেরও একটু সুসার হবে, এমন চিন্তাও মাথায় আছে বৈকি! কিন্তু সেটাই মূল কারণ নয়!

-ঠিক আছে বাবা! তোমাকে ছোটবেলা থেকেই চিনি। তুমিও আমাদের চেনো। চেনাজানা কেউ প্রস্তাব দিলে ভরসা লাগে। কারণ, তারা তো সব জেনেশুনেই অগ্রসর হয়েছে। যদি কিছু মনে না করো, আরেকটা কথা বলব।

–জি, বলুন।

–আমাদের প্রতি দয়া করছ কি না, সেটা কেন জানতে চেয়েছি বলব?

–অবশ্যই!

–বিয়েটা যদি করুণা বা দয়া দেখানোর জন্যে হয়, তাহলে সেটা আর বিয়ে থাকে না। রাজা-প্রজার সম্পর্ক হয়ে যায়। ব্যতিক্রম মানুষও আছে।

***

বিয়ে হয়ে গেল। মাকে ছেড়ে মেয়েটা স্বামীর ঘরে গিয়ে উঠল। মায়ের সাথেও প্রতিদিন দেখা হয়। কথা হয়। কয়েকটা বাড়িই তো মাঝে। প্রথম কয়েকটা দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। তারপর থেকে রং বদলাতে শুরু করল। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে খোঁটা দিতে শুরু করেছে। সে গরিব, এটাই উঠতে-বসতে তাকে মনে করিয়ে দেয়া হতে লাগল। তাদের ছেলেকে আরও বড় ঘরে বিয়ে করাতে পারত। আরও ভালো মেয়ে পেত। ছেলের মাথায় কী ভীমরতি ধরল, সে কোথাকার ফকিরনি একটাকে এনে ঘরে তুলেছে। শুরুতে আড়ালে আবডালেই এসব চলত। নববধূ না শোনার ভান করে থাকত। আস্তে আস্তে আড় ভেঙে গেল। তার সামনেই কথাবার্তা

শুরু হয়ে গেল। এটুকুতেই থেমে থাকল না। স্বামীর কানও ভাঙাতে শুরু করল। মিছেমিছি অভিযোগ করতে শুরু করল। প্রতিদিন শুনতে শুনতে কঠিন মিথ্যাকেও সত্য বলে মনে হতে থাকে। স্বামী প্রথম প্রথম অবিশ্বাসভরে এসব উড়িয়ে দিলেও, পরের দিকে তার মনেও খটকা দেখা দিল। তাই তো! কোনো কারণ ছাড়া তো এত এত অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে না।

***

শুরু হলো স্বামীর পক্ষ থেকেও অভিযোগ। স্বামীর সমর্থন পেয়ে শ্বশুরবাড়ির অন্যরা এবার সীমাহীন লাই পেয়ে গেল। লাগামছাড়া হয়ে গেল তাদের নির্যাতন। মুখ দিয়ে যা-তা বলার পাশাপাশি ঘরের সবকাজ তাকেই করতে দেয়া হলো। একটু উনিশ-বিশ হলেই আর রক্ষা নেই। সারাদিন অমানুষিক কাজ করার পরও যদি অভিযোগের মাত্রাটা একটু কমত! মাঝেমাঝে মনে হয়, কাজ করাটাই তার দোষ! কারণ, সে কাজ করলে তারা রাগ ঝাড়ার সুযোগ পায় না।

***

দুপুরের দিকে হাতে তেমন কাজ থাকে না। পুরুষেরা যে যার কাজে। মহিলারা বিছানায় গড়াগড়ি দেয়। এই ফাঁকে মেয়েটা একছুটে মায়ের কাছে যায়। সমস্ত কষ্ট মায়ের কাছে খুলে বলে। বুকের ভার কিছুটা হলেও কমে। অসহায় বিধবা মা কীই-বা করতে পারেন। মেয়েকে বোবা কান্নামাখা স্বরে সান্ত্বনা দেন। এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছে। কষ্টের মাত্রাও বেড়ে চলছে। যে স্বামী রানি করে ঘরে তুলেছিল, সে-ই এখন চাকরানি করে ঘরছাড়া করার চেষ্টা করছে। তাও মিথ্যা অভিযোগে! কীভাবে মানুষটা বদলে গেল! মিছরি থেকে ধুতরা হয়ে গেল! আশ্চর্য!

***

মায়ের বয়েস হয়েছে। মেয়ের কষ্ট আর নিজের খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। বিছানায় পড়ে গেলেন। মেয়ে দিনে একবার এসে মায়ের কাজ যতটুকু পারে করে দিয়ে যায়। নিজের স্বামীর ঘরে সুখ নেই, মাকে কীভাবে এদুর্দিনে সাহায্য করবে? মায়ের মনে ভীষণ কষ্ট, মেয়েটাকে সুখী দেখে যেতে পারলেন না। মেয়ের মনে কষ্ট, মা চলে গেলে কার কাছে মনের ভার লাঘব করবে?

***

মা শীর্ণ দুর্বল হাতটা মেয়ের মাথায় বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন,

–মা রে! আমার তো আর বেশি দেরি নেই। তোর জন্যে কলিজাটা ফেটে যাচ্ছে। আমি আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। জেনে শুনে কখনো স্বামীর অবাধ্য হইনি! পর্দা ভাঙিনি। নামায-রোযা কাযা করিনি। অজান্তে গুনাহ করে ফেললে, বারবার তাওবা করেছি। তুই আমার জন্যে চিন্তা করিস না।

–তুমি যে আমার শেষ আশ্রয় ছিলে! তুমি না থাকলে আমি কার কাছে যাব?

–ভুল বললি মা! আমি তোর শেষ আশ্রয় নই রে! আমি তুই সবারই শেষ আশ্রয় হলেন 'আল্লাহ'! আমি নেই তো কী হয়েছে? আল্লাহ আছেন। ছিলেন। থাকবেন। তোর বাবা মারা যাওয়ার পরও আমি সাহস হারাইনি। হতোদ্যম হইনি। যৎসামান্য সঞ্চয় ছিল, ওটা দিয়েই কোনোরকমে দিন পার করে দিয়েছি। ভেবেছিলাম তুই সুখী হবি। কিন্তু হলো না। তবে তোর সুখী হওয়ার সময়ও ফুরিয়ে যায়নি। মাত্র তো দুই বছর গেল। সামনে এখনো দীর্ঘজীবন পড়ে আছে। অবশ্য আল্লাহ যদি তোকে আগেই কাছে ডেকে নেন, সে ভিন্ন কথা।

–তাই যেন হয় মা, তাই যেন হয়। তুমি বিনা আমি আর পৃথিবীতে থাকতে চাই না!

–পাগলি! এমন কথা বলে না। দুনিয়া কারও জন্যে থেমে থাকে না। যাবার আগে তোকে একটা কথা বলতে চাই।

–কী কথা মা!

–আমি চলে গেলে, তুই নিঃসঙ্গ একাকী হয়ে পড়বি, এটা ঠিক নয়। আগেও তোকে কথাটা বলেছি! একটা কাজ করবি! আমি থাকতে যেমন প্রতিদিন এঘরে আসতি, আমার মৃত্যুর পরও আসবি।

–খালি ঘরে এসে কী করব! মনটা আরও বেশি খারাপ হবে !

–না হবে না। প্রথম প্রথম কষ্ট লাগলেও পরে ঠিক হয়ে যাবে। ঘরে এসে, আমার জায়নামাযটা বিছিয়ে, দুই রাকাত নামাজ পড়ে, আল্লাহর কাছে সব কষ্টের কথা খুলে বলবি। ঠিক আমাকে যেভাবে বলতি, সেভাবে। চোখের পানি ফেলে। মনের সব দুঃখ একসাথে করেই বলবি। তাহলে দেখবি, আমার অনুপস্থিতির অভাব ধীরে ধীরে কেটে যাবে।

* * *

মা নেই। মেয়েকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে পরপারে পাড়ি জমালেন। এমন দুর্দিনেও স্বামীকে পাশে পেল না। কষ্টগুলো আগের মতোই আছে।

সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি। রাতে স্বামীর বকুনি। শুধু দুপুরবেলাটা একান্ত নিজের করে পাওয়া। মায়ের কথামতো আল্লাহর দরবারে ধরনা দিতে শুরু করেছে অসহায় বিপন্ন মেয়েটা। প্রথম দিন তেমন কিছু হয়নি। আসলে আল্লাহর কাছে এভাবে কখনো বলাই হয়নি। নিয়মিত নামায-কালাম হয়েছে। বাবা-মা ছোটবেলা থেকেই এবাদতে অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন। কিন্তু আল্লাহকেই শেষ ও একমাত্র আশ্রয় মনে করার মানসিকতাটা কেন যেন গড়ে ওঠেনি। মায়ের মৃত্যুশয্যার মিনতিভরা আখেরি উপদেশ পালন করতে এসেই আল্লাহকে নতুন করে চেনার সুযোগ ঘটছে।

* * *

মায়ের কাছেও যেসব কথা বলা যেত না, মায়ের কষ্টের কথা ভেবে রেখে-ঢেকে বলতে হতো, আল্লাহর দরবারে সেসবের বালাই নেই। যা ইচ্ছে খুলে বলা যায়। আরও অবাক করা ব্যাপার হলো, মায়ের কাছে বলার সময় প্রতিদিন কান্না পেত না। যে দুঃখ-কষ্টও একটা অভ্যেসে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু রবের কাছে হাত তুললেই বুক ভেঙে কান্না আসে। আগের চেয়ে মনটা বেশি হালকা হয়ে যায়। একটা পাষাণ নেমে যায়। মনে হতে থাকে, এবার কিছু একটা হবে! এবার সমাধান হবে। কষ্টের দিন ঘুচবে।

* * *

একটা নেশার মতো হয়ে গেছে। মনটা আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। কখন দুপুর হবে। কখন আল্লাহর কাছে যাবে। এখন শ্বশুর বাড়ির যাতনাকে অসহ্য মনে হয় না। মনটাও হাসিখুশি থাকে। ব্যাপারটা এবাড়ির কুটনিদের দৃষ্টি এড়াল না। কী ব্যাপার! মা-মরা মেয়ের মুখে এমন হাসি! তারা নিপীড়নের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। কাজ হলো না। এক মহিলা বলল,

–বউকে তার মায়ের বাড়ি থেকে আসার পরই বেশি উৎফুল্ল দেখা যায়। প্রতিদিন সাথে করে ভরা কলসি নিয়ে যায়, আসে খালি কলসি নিয়ে। ব্যাপার কী! ব্যাপারটা সুবিধের ঠেকছে না। তার জামাইকে বিষয়টা তাড়াতাড়ি জানাতে হবে। এমন দুশ্চরিত্রের মেয়ে ঘরের বধূ হয়ে থাকবে! মেনে নেয়া যায় না। আমাদের সোনার টুকরা সহজ সরল ছেলেটা বলেই সহ্য করে আছে! আজ একটা হেস্তনেস্ত হতেই হবে! আরও আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল। মা-টাও বোধ হয় এমন ছিল। তার কাছেই শিখেছে। কে জানে, মা বেঁচে থাকতেই এসব শুরু করেছিল। এখন আর নিজেকে বশ মানাতে পারছে না। আমাদের সরলতার সুযোগে এই করে বেড়াচ্ছে। দেশে কি দ্বীন-ধর্ম নেই।

* * *

ছেলে এল রাতে। তাকে একান্তে ডেকে ফিসফিস করে সব সালংকারে বলা হলো। ছেলের মাথায় আগুন ধরে গেল। তাকে সমঝে-সুমঝিয়ে ঠান্ডা করা হলো। ঠিক হলো, আগামীকাল আর অফিসে গিয়ে কাজ নেই। ঘর থেকে অফিসের নাম করে বের হয়ে, সোজা শাশুড়ির ঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। একেবারে হাতেনাতে ধরা যাবে ‘দুজনকে’।

* * *

দুপুর হলো। স্বামী আড়াল থেকে অবাক হয়ে দেখল, স্ত্রী ঝটপট গোসল সারল। মায়ের রেখে যাওয়া ধবধবে শাদা পোশাকটা পড়ল। নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। দীর্ঘ মুনাজাতে ডুবে গেল। একে একে নিজের কষ্টের কথাগুলো বলল। কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না করেই, নিজের জীবনে সুখ-শান্তি কামনা করল। স্বামীর জন্যে দু'আ করল। শাশুড়ির জন্যে দু'আ করল। এমন অপার্থিব দৃশ্য দেখে স্বামীর মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। অনুশোচনায়। লজ্জায়। বিবেকের দংশনে।

* * *

–আরিয়া! তুমি কতদিন ধরে এমন করে নামায পড়ছ?

–আম্মুর ইন্তেকালের পর থেকে!

–কী আশ্চর্য! আমি এতটাই নির্দয়-নির্বোধ, একটুও টের পেলাম না! অন্ধ হয়ে অন্ধকারেই ডুবে ছিলাম! তোমার প্রতি যে জুলুম করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে হবে বলো।

–কিছুই করতে হবে না! আগে মনে ভীষণ কষ্ট থাকলেও, আম্মু মারা যাওয়ার পর থেকে কারও প্রতি কোনো রাগ নেই।

–অবাক করলে! মায়ের মৃত্যুর পর তোমার কষ্ট তো আরও বেশি হওয়ার কথা। আমরা সবাই মিলে যা করেছি!

–তেমনি হওয়ার কথা ছিল; হয়নি। তার কারণ, আম্মু মারা যাওয়ার আগের দিন, আমাকে কাছটিতে বসিয়ে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। বিশেষ করে দুটো শব্দ বলেছিলেন। আব্বুও ইন্তেকালের সময় আম্মুর অসহায় বিপন্ন অবস্থা দেখে, শব্দদুটো বলেছিলেন। সাথে ব্যাখ্যা শুনিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য আম্মু শত কষ্টেও নুয়ে পড়েননি। আপনি যখন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, সেটা ছিল আমাদের জন্যে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো। আম্মুর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল, এটা আব্বুর উপদেশ অনুযায়ী আমল করারই ফল। পরে অবশ্য কিছু সময়ের জন্যে, আমার কষ্ট

দেখে তার বিশ্বাসে কিছুটা চিড় ধরেছিল। ইন্তেকালের আগে আবার আল্লাহর প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন।

–শব্দ দুটো কী কী?

–সেগুলো আসলে কুরআনের একটা আয়াতের অংশ! সূরা 'আলাক' মানে ইক্বরা-এর শেষ দুটি শব্দ।

উসজুদ ইকতারিব!

তুমি সিজদা করো। নিকটবর্তী হও!

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন সবে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া আরম্ভ করেছেন। প্রকাশ্যে কাবাচত্বরে নামায পড়তে শুরু করেছেন। আবু জাহলের এনিয়ে ভীষণ উষ্মা! সে নামায বন্ধ করার জন্যে অতি তৎপর হয়ে উঠল। বাধা দিতে এল। দম্ভভরে বলল,

–তুমি নামায পড়লে আমি পা দিয়ে তোমার গর্দন পিষে দেব। (নাউযুবিল্লাহ)

আবু জাহলের এই দম্ভোক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ সূরা আলাকের ছয় থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো নাযিল করেন। প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হয়েছিল আরও আগে। সেই শুরুতে। হেরা গুহায়।

নবীজি আবু জাহলের কথা শুনে তাকে উল্টো ধমক দিলেন। আবু জাহল তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলেছিল,

–মক্কায় আমি একা নই। আমার একান্ত বৈঠকে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। আমি ডাকলেই তারা ছুটে আসবে।

নরাধমের এহেন ঔদ্ধত্যের জবাবে আল্লাহ পাল্টা জবাব দিয়েছেন।

সুতরাং সে ডাকুক তার জলসা-সঙ্গীদের!

আমিও ডাকব জাহান্নামের ফেরেশতাদের।

হে নবী! আপনি তার আনুগত্য করবেন না।

আপনি আমার সিজদা করুন।

তাহলে আপনি আমার আরও নিকটবর্তী হতে থাকবেন!

* * *

নবীজি সিজদার মাধ্যমে সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়েছিলেন। আল্লাহর কাছাকাছি হয়েছেন। আম্মুকেও দেখেছি দিন দিন আল্লাহর আরও কাছে, আরও কাছে যেতে। আমিও সে চেষ্টায় রত ছিলাম। যাতে সব কষ্ট ভুলে থাকা যায়। আর এটা পেয়ারা নবীর আদর্শ। সুন্নাত। তারচেয়েও বড় কথা, আল্লাহর দেয়া 'ব্যবস্থাপত্র'।

* * *

–আরিয়া! তুমি এতকিছু জানো। কখনো টের পেতে দাওনি তো!
–আপনি টের পেতে চেয়েছেন?
–চলো, আজ আর ঘরে ফিরব না! এখানেই কিছুসময় কাটিয়ে দিই!
–কেন টের পেতে ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি!
–তোমার হচ্ছে না?
–জি।
–তবে আর দেরি কেন?
–এ্যাই! হচ্ছে কি এসব, আমাদের ঘরের কলটা নষ্ট তো।

জীবন জাগার গল্প : ৬৮৫

একটি মা একটি জাতি

মানুষটাকে দেখলেই বোঝা যায়, ধর্মকর্মের অতটা ধার ধারেন না। বিশেষ পরিচয়ের সূত্রে তার গাড়িতে উঠতে হলো। আমাদের গাড়ি কুয়ালালামপুরের বাইরে একটা গ্রামে যাচ্ছিল। আমি পথেই নেমে যাব। গাড়ির পেছনের আসনে তার দুই ছেলে। শহরের স্কুলে পড়ে। এখন বাড়ি যাচ্ছে। মায়ের কাছে। একটু পর অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, বাচ্চা দুটো কিছুক্ষণ পরপরই 'আল্লাহু আকবার' বলছে। আবার সুবহানাল্লাহ বলছে। মাঝে মাঝে আলহামদুলিল্লাহ বলছে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছে। প্রথম প্রথম কিছু বললাম না। তাদের আনন্দে বাগড়া দিতে মন চাইল না। দু-ভাই বেশ আনন্দ আর উৎসাহের সাথেই কাজটা করছে। মনে হলো তারা প্রতিযোগিতা করছে। কে কার আগে বলবে। কে কার চেয়ে বেশি বলবে!

* * *

শেষমেষ থাকতে না পেরে তাদের বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম,
–ওদের কচিমুখে যিকির শুনতে বেশ ভালো লাগছে! সবসময়ই এভাবে যিকির করে বুঝি?
–ঠিক সবসময় নয়। তারা আসলে নবীজির একটা সুন্নাত পালন করছে। তিনি সফরে গেলে, উঁচুতে আরোহণ করার সময় আল্লাহু আকবার বলতেন। নিচে নামার সময় সুবহানাল্লাহ বলতেন। বাচ্চারাও তাই করছে।
–আপনাকে দেখে তো ধার্মিক মনে হয় না। তারা এসব শিখল কোথা থেকে?

–তাদের মায়ের কাছে!

–আপনি বড়ই সৌভাগ্যবান! এমন একজন স্ত্রী ঘরে তুলতে পেরেছেন।

–তা বলতে পারেন। আমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। অনেক বড় এক পুরস্কার। সন্তানকে দ্বীনদার হিশেবে গড়ে তুলতে তার মেহনত-মোজাহাদার কোনো শেষ নেই!

–তিনি কি বিশেষ কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করেন? এত ছোট বয়েসেই বাচ্চা দুটো যিকিরে অভ্যস্ত হয়ে গেল?

–ওদের মা প্রতিটি কাজই সুন্নত তরিকায় করার চেষ্টা করে। ধরুন 'বাথরুমে' যাবে, প্রবেশ করার আগে বাচ্চাদের শুনিয়ে শুনিয়ে জোরে জোরে দু'আ পড়ে। কখনো বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করে, বলো তো এখন কোন দু'আটা পড়ব? এখন কোন পা দিয়ে প্রবেশ করব?

বাচ্চারাও কোনো কাজ করতে গেলে, প্রথমেই মাকে সে কাজের আদব ও সুন্নাত বলে যেতে হয়। না পারলে মায়ের মুখে মুখে বলে তারপর যেতে হয়। ঘুম-খাওয়া-নাওয়া স্কুলে যাওয়া সবখানেই তাদের প্রথম প্রথম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হতো। এখন ওরা এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

* * *

বাচ্চাদের মায়ের আরেকটা সুন্দর পদ্ধতি আছে। ছোটদের মাঝে ঝগড়া-তর্ক লেগেই থাকে। খুনসুটি, মন কালাকালি হরদম হতেই থাকে। দুই ভায়ের কারও মুখ থেকে যদি রাগের মাথায় বেফাঁস কথা বের হয়ে যায়, তাদের মা সাথে সাথে দুজনকেই কাছে ডাকে। শাসনের স্বরে। একটু রাগত ভঙ্গিতে।

–দুজনই এদিকে এসো! বসো। আচ্ছা আমাকে বলো, তুমি কাকে বেশি ভালোবাসো? শয়তানকে না আল্লাহকে?

–আম্মু, আমি আল্লাহকে বেশি ভালোবাসি!

–তুমি কি আল্লাহর বন্ধু হতে চাও নাকি শয়তানের বন্ধু?

–আমি আল্লাহর বন্ধু হতে চাই!

–তোমার কাজে তো সেটার প্রমাণ পেলাম না। তুমি এখন যে ভাইয়াকে 'কটু কথা' বললে, এমন কাজ শুধু শয়তানের বন্ধুরাই করে! আল্লাহর বন্ধুরা কখনোই এমন কাজ করে না। যে এমন কাজ করে, শয়তান তার পিঠে চড়ে বসে বসে হো হো করে হাসতে থাকে! তুমি কি চাও শয়তান তোমার কাজ দেখে খুশিতে হাসুক?

–জি না, আম্মু আমি শয়তানকে হাসাতে চাই না।

–কী করতে চাও?
–আমি শয়তানকে কাঁদাতে চাই।
–তাহলে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।
–কী কাজ আম্মু?
–কেবলামুখী হয়ে, একশ বার 'ইস্তেগফার' করতে হবে।

* * *

–আম্মু, একশবার পড়েছি।
–এত তাড়াতাড়ি! কিন্তু শয়তানের কান্না তো ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে না। আরও পঞ্চাশবার পড়ে এসো!
–আম্মু, পড়েছি!
–উঁহুঁ! শয়তানের কান্নাটা বড্ড আস্তে শোনা যাচ্ছে! আরও বিশবার পড়ে দেখো তো! তার কান্নার আওয়াজ বাড়ে কি না দেখি!
–আম্মু, পড়েছি! কান্না শোনা যাচ্ছে?
–হুঁ, তবে আরও জোরে কাঁদাতে পার কি না দেখো! দশবার পড়ে ফেলো।
–পড়েছি!
–এবার হয়েছে! শয়তান এবার হাউমাউ করে কাঁদছে!
–আম্মু! শয়তানকে আরও জোরে কাঁদাই?
–তাহলে তো খুবই ভালো! সে ভবিষ্যতে তোমার কাছে ঘেঁষার সাহস করবে না!

* * *

একটা শিশু ছোটবেলা থেকেই এভাবে আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দ জেনে গেলে এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার শিক্ষা পেলে, বড় হলে এমন ছেলে বাবা-মায়ের অবাধ্য হতে পারে না। কারণ, সে জানে বাবা-মায়ের সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টি।

* * *

আগের যুগের মানুষ সম্পর্কে আমরা নানা কথা শুনি। তাদের অনন্য কীর্তির কথা পড়ি। এখন সেগুলো অবিশ্বাস্য মনে হয়। একটু চিন্তা করে দেখলেই সেগুলোকে অসম্ভব মনে হবে না। তারা জন্মের আগে থেকেই একজন 'নেককার' মায়ের ছায়াতে ছিল। একজন ধার্মিক মায়ের কোলে বড় হয়েছিল। একজন মুত্তাকী মায়ের আঁচল ধরে পৃথিবীকে চিনেছিল। একজন পর্দানশীন মায়ের শাসনে বেড়ে উঠেছিল।

* * *

একজন মহিয়সী মায়ের কারণেই একটি শিশু সাত বছর বয়েসেই কুরআনের হাফেজ হয়ে যায়। কেউ নয় বছরে হাফেজ হয়ে যায়। মায়ের নিবিড় তত্ত্বাবধানের বরকতেই ইমাম শাফেয়ী (রহ.) মাত্র চৌদ্দ বছর বয়েসেই 'ফতোয়া' দিতে শুরু করেছিলেন। একজন ইলমপিপাসু মায়ের কারণেই, ইমাম নববী রহ. মাত্র বারো বছর বয়সে প্রতিদিন বারোজন শায়খের কাছে পাঠ নিতে যেতেন!

জীবন জাগার গল্প : ৬৮৬

বাসর

আমাদের মাদরাসার অদূরের একটি গ্রাম। নাম 'বাউন'। আমাদের বন্ধু 'তৈয়বের' বাড়ি এই গ্রামে। আমরা মাঝেমধ্যে, বৃহস্পতিবারে ছুটি হলে, দলবেঁধে তার বাড়িতে বেড়াতে যেতাম। খুবই সুন্দর একটা গ্রাম। এখানকার মানুষ এমনিতেই বৃক্ষবান্ধব। সবাই গাছ লাগানোর প্রতি উৎসাহী। চারদিক কী সবুজ শ্যামল! চোখ জুড়িয়ে যায়! পূর্ব দিকে ঘন বনানী। সেখান থেকে একটা পাহাড়ি খাল বয়ে এসে পুরো থানাকে যেন বহুগুণ উর্বর করে তুলেছে। প্রতিটি বাড়িই গাছ-গাছালিতে ভর্তি!

* * *

'বাউন' গ্রামটাও ছায়াঘেরা নিবিড়। স্নিগ্ধ। মনোরম। সেদিন আমরা পৌছতে পৌছতে রাত হয়ে গেছে। আমজুর হাট নেমে হেঁটে হেঁটেই দীর্ঘপথ এসেছি। এতগুলো সদ্য কৈশোরের শেষ সীমায় পৌছা একদল ছেলে একসাথে হলে গাড়িতে উঠতে ইচ্ছে করে? গ্রামের পথ গাড়িতে চড়ার জন্যে নয়, হাঁটার জন্যে। গ্রামের পথ চাঁদনি রাতে অভিসারে বের হওয়ার জন্যে। নিশি রাত বাঁকা চাঁদ আকাশে। এমন রাতে ঘরে থাকার জন্যে নয়।

* * *

তৈয়ব আগে থেকেই বলে রেখেছিল, আমাদের জন্যে বিশেষ কিছু একটা অপেক্ষা করছে। বাড়ি গেলাম। চিনিপানা (শরবত) দিল। আরও নানা আয়োজন। দিলদরাজ পরিবার। মুক্তহস্ত। উপুড়হৃদয়। সাথে ছিলাম আমি, দুই ফারুক, সাইফুল, মাকসুদ। বিশাল দল।

* * *

কিছুক্ষণ পর একে একে অনেকে এল। তৈয়ব সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় নাম বলল, বাসর।
–কী নাম বললি?
–বাসর। বাসর।
–যাহ! বাসর কারও নাম হয় নাকি?
তৈয়ব মিটিমিটি হেসে জবাব দিল,
–হয় রে হয়! কীভাবে হয় একটু পরেই টের পাবি।

* * *

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর্ব চুকে গেল। অবাক হয়ে দেখলাম আশেপাশের বাড়ি থেকেও মেয়ে-মহিলারা পানের বাটা, তালপাখা নিয়ে একজন-দুজন করে উঠোনে হাজির হচ্ছে। আমরা আগে থেকেই বিশাল বড় উঠোনে শীতলপাটিতে গা এলিয়ে দিয়েছি। আকাশের তারা গুনছি। এলোমেলো গল্প করছি। মানুষের আনাগোনা লক্ষ করছি।

* * *

তৈয়ব কাছে নেই। দৌড়াদৌড়ি করছে। উঠোনের একপাশে একটা মঞ্চের মতো কী যেন একটা সাজাচ্ছে। আমরা জিজ্ঞেস করলে বলল, সার্কাসের মঞ্চ সাজাচ্ছি। আমরা জুলজুল চোখে তাকিয়ে আছি। কী হয় কী হয়? আগামীকাল সারাদিন কী করব তার পরিকল্পনা সাজাচ্ছি। মাকসুদ সাঁতার জানে না, তাকে সাঁতার শেখাতে হবে। পুকুরে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে হবে। খেতে মিষ্টি আলু করা হয়েছে, সেটা তুলে খেতে হবে। নদীতে নৌকা বাইতে হবে। আর কত কী!

* * *

মঞ্চ সাজানো হলো। এবার সবাইকে দেখলাম মঞ্চের চারপাশ ঘিরে বসছে। ছোট ছেলেমেয়েটার হুটোপুটি করছে।
–তৈয়ব! এবার বল না, কী হচ্ছে?
–বাসর হবে, বাসর।
–সেটা আবার কী?
–এ্যাই ব্যাটা, বাসরও বুঝিস না!

* * *

ছেলে-মেয়ে, কিশোর-কিশোরী, বুড়ো-বুড়ি, যুবক-যুবতীতে ভরে গেছে বড় উঠোন। মঞ্চটা চারপাশ থেকে পর্দা দিয়ে ঘেরা। তৈয়বের ছোট ভাই

একটা বিড়াল নিয়ে এল। বিড়ালের গলায় রশি লাগানো। সাইফুলের হাতে বিড়ালটা দিয়ে ধরে রাখতে বলল। পরে লাগবে। বিড়াল কিছুক্ষণ টানাটানি করে ছুটতে না পেরে, বিকট এক ভেচকি দিয়ে ভয় দেখিয়ে পালিয়ে গেল।

* * *

সবাই বিড়ালের পিছু পিছু ছুটল। ধর ধর ধর। সাইফুল আর ফারুক অনেক যুদ্ধ করে বেড়ালটাকে বগলদাবা করে নিয়ে এল। মাকসুদটা ভিতুর ডিম। সে এতক্ষণ আগের জায়াগতেই বসে ছিল। বেড়ালের গলায় রশি থাকাতেই রক্ষে! নইলে এরাতে পাজি বিড়ালটা রীতিমতো চিতাবাঘের মতোই ছুটছিল! ধরা মুশকিল ছিল!

* * *

শুরুহলো মূল পর্ব। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। বাসর দেখব। উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের আর তর সইছে না।
পর্দা উঠল। অবাক হয়ে দেখলাম, তৈয়বের একজন বন্ধুকে বধূবেশে একটা খাটের ওপর বসিয়ে রাখা হয়েছে। তৈয়ব গিয়ে বেড়ালটাকে মঞ্চের একটা খুঁটির সাথে বেঁধে রেখে এল।

* * *

একটু পর দুলামিয়াঁ এল। আরে সেই বাসর নামী বন্ধুই দেখছি 'নওশা' সেজে এসেছে। মৃদু গুঞ্জরণ শুরু হয়েছে। আমরা আগে দেখিনি, তাই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। দুলা কাল্পনিক দরজা খুলে বাসর ঘরে প্রবেশ করল। প্রবেশ করেই এক কোণে খুঁটির সাথে বাঁধা বেড়ালটাকে হ্যাঁচকা টানে রশিসহ উঠিয়ে নিয়ে জোরে এক আছাড় মারল। বিড়াল ম্যাঁওওওওওওওও করে দৌড়ে পালাল। ভাগ্যিস মঞ্চের এক কোণে একগাদা খড় জড়ো করে রাখা ছিল। বেড়ালটাকে কায়দা করে সেখানেই ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল। নিখুঁত ব্যবস্থা। 'গুরবাহ কাশতন শবে আইয়াল বায়দ।' যাকে বলে বাসর রাতে বেড়াল মারা আরকি!

* * *

আমাদের হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ার অবস্থা। দুলামিয়াঁর সে কি ভাব। ঠাটবাট। আস্তে আস্তে খাটের দিকে এগিয়ে গেল। একেবারে অনুকরণীয় ভঙ্গিতে বধূর চিবুক তুলে ধরল। মাথার ঘোমটা সরিয়ে কপালের চুল ধরে সশব্দে দু'আটা পড়তেও ভুলল না। আল্লাহুম্মা...।
মাকসুদ বলল,
–এ যে দেখি সত্যিকার বাসর শুরু হলো রে!

সাইফুল টিপ্পনী কেটে বলল,
–তুই মনে হয় আগে থেকেই বাসরের সাথে পরিচিত!
এবার দুজনে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল।

* * *

দুলা প্রেম গদগদ কণ্ঠে বলল,
–ওগো! চলো আগে দুই রাকাত নামায পড়ে নিই। আমাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের জন্যে, অনাগত সন্তানদের জন্যে কায়মনোবাক্যে দু'আ করি।
পর্দা পড়ে গেল। যাকে বলে, যবনিকাপাত। একটু পর আবার পর্দা উঠল।

* * *

দুজনে খাটে বসা। নওশা বিবির হাত ধরে আলাপ শুরু করল। সেকি ডায়লগ! পুরো মজমা হাসতে হাসতে পেটে খিল। এমনি বধূবেশী সেলিমও হাসি চেপে রাখতে পারছে না। কিন্তু খুরশিদ মানে বাসরের মুখে হাসির লেশমাত্রও নেই। সে যেন সত্যি সত্যি দুলা। খোদ শাহজাদা সেলিম হয়ে আনারকলিকে সম্বোধন করছে!

* * *

একপর্যায়ে বাসরের অভিনয় এতই পরিণত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, বধূবেশী সেলিম পর্যন্ত তন্ময় হয়ে ঘোরলাগা চোখে, নিস্পলক তাকিয়ে 'স্বামীর' কথায় মাথা নেড়ে সায় দিতে শুরু করল।
–মিলি! তুমি কিন্তু আমার ওপর রাগ করে থাকতে পারবে না। আমি রাগ করলেও না। আর শোনো, আমি পুঁটি মাছের দো-পেঁয়াজা খুব পছন্দ করি। কলই ডালের বড়া খেতে পছন্দ করি, তুমি না পারলে শিখে নেবে। আর তোমার প্রিয় মাছ কোনটা সেটা আমাকে জানিয়ে দিয়ো।
এভাবে প্রায় আধঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বাসর তার সংলাপ আউড়ে গেল। শেষের দিকে তার বক্তব্যগুলো এত বেশি আবেগঘন হয়ে উঠেছিল যে, এ যে মিথ্যে, এটা যে দুষ্টুমি সেটাই উপস্থিত দর্শকদের কেউ কেউ ভুলে গিয়েছিল। কয়েকজনকে দেখলাম বারবার চোখ মুছছে।

* * *

শেষ করার একটু আগে, সে যখন বলল,
–মিলি! তুমি যদি পঙ্গুও হয়ে যাও, আমি তোমার সেবা করে বাকি জীবন কাটিয়ে দেব। তুমি অন্ধ হয়ে গেলে আমি তোমার হাতের লাঠি হব। তুমি বোবা হয়ে গেলে আমি তোমার কথা হয়ে থাকব। তুমি স্মৃতিহীন হলে,

আমি তোমার স্মৃতি হয়ে থাকব। তবুও তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। তোমাকে নিজ হাতে খাইয়ে দেব, নাইয়ে দেব। চুল আঁচড়ে দেব। বেণি করে দেব। তোমার সাথে সাপ-লুডু খেলব। রাতের বেলায় তালপাখার বাতাস করে তোমায় ঘুম পাড়াব। দখিনের জানালা খুলে চাঁদনি রাত কাটাব। তোমার শিয়রে বসে গল্প শোনাব। চুলে বিলি কেটে তোমার মাথাব্যথা ভালো করে দেব। গভীর রাতে কুপি জ্বেলে তোমাকে 'বাহির' থেকে ঘুরিয়ে আনব। তোমার পাতের মাছের কাঁটা আমি বেছে দেব। তোমার জন্যে পিতলের তৈরি পানের বাটা এনে দেব। শেষরাতে শীতল বাতাসের পরশে, কুণ্ডুলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকা তোমার গায়ে আলগোছে সুজনি কাঁথা ছড়িয়ে দেব।

* * *

এমন আবেগঘন কথা শোনার পর, একটা মেয়েকে দেখলাম আঁচল চেপে হু হু করে কাঁদতে কাঁদতে, দৌড়ে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে। হয়তো তার কোনো ব্যথার স্মৃতি মনে পড়ে গেছে। পরে জেনেছি, মেয়েটাকে তার স্বামী অকথ্য নির্যাতন করে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে!

* * *

অন্যদের কথা আর কী বলব, আমাদের পর্যন্ত চোখ ভিজে উঠেছিল। আহা এমন ভালোবাসা যদি আমিও কারও কাছ থেকে পেতাম!বাসর রাতে হয়তো এত কথা হয় না। এত সংলাপ হয় না। এত নাটকীয় কথোপকথন হয় না। কিন্তু অবাক হয়ে ভাবলাম, ক্লাস টেনে পড়া একটা ছেলে এতটা নিখুঁত করে কীভাবে বাসর কথা শিখল? এত অভিজ্ঞ সংলাপই বা সে কোত্থেকে জোগাড় করল?

* * *

পরে তৈয়বের কাছে জেনেছি, সে একটা বইয়ে বাসরের বর্ণনা পড়ার পর থেকেই তার মাথায় এই পোকা ঢুকেছে। প্রথম প্রথম সে একা একাই সংলাপ বলত। পরে বন্ধুদের সাথে। অল্প কদিনেই সে একজন বাসর-সংলাপ জিনিয়াসে পরিণত হলো। তার কথার মধ্যে কোনোরকমের অস্বাভাবিকতা ছিল না। শ্রুতিকটু কিছু ছিল না। ছিল নির্মল-নির্দোষ-নিদাঘ কথা। সুখ-দুঃখের বর্ণনা। আবেগমথিত কিছু উচ্চারণ। শুনলে মনটা যে কারও ভিজে উঠবে। একটি পরিচ্ছন্ন সম্পর্কের স্বপ্ন জেগে উঠবে। প্রেমপূর্ণ একটি সংসারের লোভ জেগে ওঠাও বিচিত্র কিছু নয়।

* * *

আমরা ভেবেছিলাম নিছক একটা হাসির আয়োজন হবে ব্যাপারটা। কিন্তু দুলা নিজেই যখন কাঁদতে কাঁদতে সংলাপ বলতে শুরু করল, বধূবেশী সেলিমের চোখ পর্যন্ত টলোমলো করতে শুরু করে দিয়েছিল।

* * *

খুরশিদের অভিনয়-প্রতিভা দেখে, স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে, বিয়েবাড়িতে তার ডাক পড়তে শুরু হলো। সেও চুটিয়ে বাসর অভিনয় করে যেতে লাগল। কিছুদিন পর, আমরা বাসরকে মাদরাসায়ও দাওয়াত দিয়ে এনেছিলাম। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর। ছুটির আগের রাতে। এবার আমরা আমরাই তার বাসর উপভোগ করলাম। সমস্যা বেঁধেছিল ঠিক শেষ মুহূর্তে।

* * *

যিম্মাদার হুযুর কীভাবে যেন খবর পেয়ে বেত হাতে এলেন। কী দুলা আর কী বধূ! এলোপাতাড়ি সেকি মার লাগালেন! হুযুর পিটাচ্ছেন আর বলছেন,
–বিয়া গরিবার শখ অইয়ে দে ন! আয়! তোরারে গম করি বিয়া গরাইর!
(তোদের বিয়ে করার শখ হয়েছে না! আয় তোদের ভালো করে বিয়ে করিয়ে দিই।)
মজার বিষয় হলো, হুযুরও হাসছেন। আমরা পিটুনি খাচ্ছি আর ইঁদুরের মতো ছোটাছুটি করছি। কোন ফাঁকে যেন 'দুলা-বাসর' ছিটকে কামরা থেকে বেরিয়ে সোজা 'বাউন' চলে গেল।

জীবন জাগার গল্প : ৬৮৭

সাকানা মাওয়াদ্দাহ রহমাহ

মানুষ জ্ঞানগম্যিতে যত বড় হয়, তার কথা ততই কমতে থাকে। মানুষেরই যদি এঅবস্থা হয়, আল্লাহ তা'আলার কথা কেমন হবে? বিয়েশাদি-বিষয়ক আয়াতগুলোর দিকে তাকালেই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়। মাত্র তিনটা শব্দে কুরআন কারীম পুরো দাম্পত্য জীবনকে তুলে ধরেছে। শব্দগুলোর বিশ্লেষণের আগে কয়েকটা আয়াতের ভাব-তরজমা দেখি।

১. তিনিই পানি দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে বংশগত ও বৈবাহিক আত্মীয়তা দান করেছেন। [ফুরকান(২৫) :৫৪]

২. আল্লাহ তিনি, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। এবং তার থেকে তার স্ত্রীকে বানিয়েছেন। যাতে সে তার কাছে এসে শান্তি লাভ করতে পারে। [আ'রাফ (০৭) : ১৮৯]

৩. নারীদের মধ্য থেকে যাকে তোমাদের পছন্দ হয় বিবাহ করো। [নিসা (০৪) : ০৩]

৪. তারা তোমাদের জন্যে পোশাক এবং তোমরাও তাদের জন্যে পোশাক। [বাকারা (০২) : ১৮৭]

৫. তার এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদেরই মধ্য থেকে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ করো। তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন আছে, সেইসব লোকের জন্যে যারা চিন্তাভাবনা করে। [রূম (৩০) : ২১]

৬. আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে যেমন তাদের প্রতি স্বামীদেরও অধিকার রয়েছে। [বাকারা (০২) : ২২৮]

৭. পুরুষ নারীদের অভিভাবক। যেহেতু আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থসম্পদ ব্যয় করে। [নিসা (০৪) : ৩৪]

* * *

আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলে, অনেক অনেক দিক ধরা পড়া। তাফসীরের কিতাবগুলোতেও দীর্ঘ দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। চমৎকার সবদিক উঠে এসেছে! আমরা শুধু শিরোনামের তিনটা শব্দ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলছি:

এক. বিয়েশাদি আল্লাহর অপূর্ব এক নিদর্শন। আয়াত। তুচ্ছ কোনো বিষয় আল্লাহর নিদর্শন হতে পারে না। দুজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের মধ্যে কীভাবে এতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে? এতটা নির্ভরতা তৈরি হয়? এতদিন এই গভীর ভালোবাসা কোথায় লুকিয়ে ছিল? একটা মাত্র শব্দ 'কবুল' বলার সাথে সাথেই কুলকুল করে মহব্বত উৎসারিত হতে শুরু করে? এটাই তো অনেক বড় 'আয়াত'! নিদর্শন! এছাড়া আরও কত কিছু যে দুজনের মাঝে ঘটতে শুরু করে, যা আগে কল্পনাই করা যায়নি!

দুই. বিয়েটা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্যেই শান্তি ও প্রশান্তির। সাকান (سكن)। সান্ত্বনা। প্রবোধ। নিরাপদ আশ্রয়। নির্ভরতা। যাবতীয় অস্থিরতা নিরোধক। সুস্থিরতা আনয়নকারী। একজন আরেকজনের জন্যে শান্তির আধার হবে। দুজনেই একে অপরের প্রশান্তির কারণ হবে। একজনের কথা, চিন্তা, কাজ, আচরণ, সাক্ষাৎ, কল্পনা, সঙ্গ আরেকজনের জন্যে পরম পরিতৃপ্তি, নির্ভরতা, আশ্বস্তি বয়ে নিয়ে আসবে।

তিন. বিয়ে দুটি মানুষের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টির মাধ্যম। মাওয়াদ্দাহ (مودة) সৌহার্দ্যের উৎস। মাওয়াদ্দাহর মধ্যে কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়ার প্রবল তাড়না থাকে। তামান্না থাকে। যৌবনে যা হয়ে থাকে। স্বামী ও স্ত্রী একে অপরকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে থাকে! দূরে গেলে কাছে টেনে নিয়ে আসে। অদৃশ্য এক সম্মোহনী শক্তি দুজনকে বেঁধে রাখে। অদেখা এক বাঁধন দুজনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখে। যৌবনের সম্পর্ক বোঝানোর জন্যে মাওয়াদ্দাহ ব্যবহার করা হয়েছে।

চার. বিয়ের প্রথম দিকে পরস্পরের প্রতি জৈবিক আকর্ষণ থাকলেও, শেষবয়েসে এসে এই তাড়না থাকে না। তখন দুজনের মধ্যে নেয় এক ধরনের নির্ভরতা। না বলা এক অনুরাগ। রহমত (رحمة)। দয়া। অচ্ছেদ্য এক বাঁধন! বার্ধক্যের সম্পর্ককে বোঝানোর জন্যে রহমত ব্যবহার করা হয়েছে।

* * *

সাকানাহ

মানুষটা প্রচলিত অর্থে নিরক্ষর। পেশায় বাবুর্চি। তাবলীগের মেহনতের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত! উজানী মরহুম পীর সাহেবের হাতে বায়আত। বুঝ হওয়ার পর থেকেই ওলামায়ে কেরামের সাথে ওঠবসা। এজন্য এক মাদরাসার প্রবীণ প্রধান মুফতী সাহেব নিজের মেয়েকে তার সাথে বিয়ে দিতে চেয়েছেন। মানুষটা তাকওয়া ও পরহেজগারী দেখে।

কওমী মাদরাসায় মাসিক ওযীফা (বেতন) সবসময় নিয়মিত সময়মতো পাওয়া যায় না। এখন হয়তো দিনকাল বদলেছে। এমনকি ঈদের সময়ও পুরো বেতন মেলে না। ফান্ডে টাকা থাকে না যে! আমরা তাকে খাদেম সাহেব বলে ডাকি! চার সন্তান! দুই ছেলে হাফেজ! মানুষটার সাথে অনেক লম্বা সময় নিয়ে কথা বলি! তার সারল্যমাখা দ্বীনদারি সত্যিই মুগ্ধ করে! কোনো ভান নেই। কে কী বলল, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সময় হলে জিকির করছে। পীর সাহেবের সবক আদায় করছে। বিয়ের আগে এমনও হয়েছে, সারাক্ষণ যিকিরের কারণে আশেপাশের লোকজন তাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখত। পীর সাহেবের সবক ছিল:

-সব সময় যিকিরে-ফিকিরে থাকবে। একটা মুহূর্তও যেন যিকির থেকে খালি না যায়।

খাদেম সাহেব যেন হাদীসেরই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। হুযুরের মেয়ের প্রস্তাব পেয়েও এই 'নিরক্ষর' মানুষটা অত্যন্ত ভদ্রভাবে এড়িয়ে গিয়েছিল সেই প্রস্তাব! বড্ড কৌতূহলী হলাম!

-কেন এতবড় একটা সৌভাগ্যকে পাশ কাটিয়ে গেলেন?

-আমি কীভাবে হুজুরের মেয়েকে বিয়ে করার কথা কল্পনা করতে পারি? উনি কতবড় আলেম, মুফতী! তার মেয়েও সবদিক দিয়ে যোগ্য! আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি! আমার ঘরবাড়ি নেই! কোথায় রাখব এমন মেহমানকে? আমি সবসময় হুজুরের খেদমত করি, হুজুরের সাথে গাশতে যাই, হুজুরের সাথে শবগুজারি করি। একসাথে থাকতে থাকতে আমার প্রতি হুজুরের মহব্বত কায়েম হয়ে গেছে! হুজুর মহব্বতের তাকিদেই মেয়েকে আমার হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন! এখন আমারও উচিত সেই মহব্বতের প্রতিদান দেয়া! এবং বিয়ে না করাই ছিল সেই মহব্বতের তাকিদ! অবশ্য বিয়ে না করার পেছনে আরেকটা প্রধান কারণ ছিল!

-কী কারণ?

-আমাদের বাড়ির পাশে একটা গরিব পরিবার আছে। খবর পেয়েছি, তাদের একটা মেয়ে আছে। মাজুর। পায়ে সমস্যা আছে। মেয়ের বাবা এক মাদরাসার শিক্ষক। অত্যন্ত গরিব। মেয়ের বিয়ে নিয়ে খুব বেশি পেরেশান না হলেও, আমি দেখেছি হুজুর প্রতিদিন মাগরিবের পর দীর্ঘক্ষণ কেঁদে কেঁদে দু'আ করেন। একদিন হুজুরের দু'আর একটা বাক্য আমাকে বেশ নাড়া দিল! হুজুর আল্লাহর কাছে বারবার বলছেন:

-আমার মেয়েটার একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। মেয়েটা বড় হয়ে গেছে! আমি গরিব বলে খরচ করে বিয়ে দেয়ার তাওফীক নেই। ও আল্লাহ! মেয়েটাকে পঙ্গু তো আপনিই বানিয়েছেন! আমাকে কখনো এনিয়ে আপনার কাছে অভিযোগ করতে দেখেছেন? জন্মের পর তাকে পঙ্গু দেখার পরও আমার মনে সামান্যতম আক্ষেপ জাগেনি! আপনি আমাকে মেয়ের হাদিয়া পাঠিয়েছেন, হোক না পঙ্গু, আমার এখানে আক্ষেপ করার কী আছে! মাওলা! আপনি আমার মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। মেয়েটা বড় বেশি মনোকষ্টে আছে! তার সমবয়েসীদের বিয়ে অনেক আগেই হয়ে গেছে! আমি জানি আপনি যা করেন বান্দার ভালোর জন্যেই করেন! এজন্য আমি সবর করে থাকতে পারি! কিন্তু মেয়ের মা যে কষ্ট সহ্য করতে পারছে না!

হুজুরের মুনাজাত শোনার পরপরই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম আমি এখানে সম্পর্ক করব। অন্তত প্রস্তাব দিয়ে দেখব! আল্লাহর কী অদ্ভুত মহিমা! পরদিন আমি আমার হুজুরের খেদমতে হাজির হলাম! একথা-সেকথার পর হুজুর নিজের মেয়ের প্রস্তাব নিজেই পেশ করলেন। আমি চমকে উঠলাম! এতদিন আমি গরিব বলে আমার কাছে কেউ মেয়ে বিয়ে

দেয়ার কথা কল্পনাও করত না! অথচ এখন দেখি চারদিক থেকেই বিয়ের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে!

আমি আরেকদিন সময়-সুযোগমতো হুজুরকে বললাম!

-আমাকে মাফ করতে হবে!

-কিসের মাফ!

-আমি 'বিয়েটা' করতে পারব না!

-কেন কোনো সমস্যা?

-জি না হুজুর! কোনো সমস্যা নেই!

-তাহলে?

তখন হুজুরকে সবকিছু খুলে বললাম। আমি যেই হুজুরের মেয়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তিনিও মুফতী সাহেব হুজুরের মাদরাসারই শিক্ষক! আমি মাফ চেয়ে একটা কথা বলেছিলাম! হুজুর কথা শুনে সাথে সাথে শোয়া থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে বললেন:

-...সুর! তুই যে এত ভালো মানুষ, সেটা আগে বুঝতে পারিনি কেন?

-খাদেম সাহেব! আপনি মুফতী সাহেব হুজুরকে কী বলেছিলেন?

-আমি বলেছিলাম: হুজুর! আপনার মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে বড় বড় শায়খুল হাদীসরা লাইন ধরে আছে! আমি খবর পেয়েছি! এমনকি ঢাকার দ্বীনদার এক কোটিপতিও তার ছেলের বউ করার জন্যে হুজুরের কাছে কাকরাইলে প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল! ওই যে হুজুর যেবার বিদেশে তিন চিল্লার সফর থেকে ফিরেছিলেন সেবার!

আমি চিন্তা করে দেখেছি! যে মেয়েকে বিয়ের জন্যে সবাই লাইন ধরছে! তাকে বিয়ে করা উচিত নাকি যাকে কেউ বিয়ে করতে চাচ্ছে না, তাকে বিয়ে করা উচিত? পর্দা-পুশিদায় দুজনই সমান, জ্ঞান-গরিমায়ও হয়তো সমান! শুধু একটু খুঁত! অবশ্য এক জায়গায় বিয়ে করলে, আমার টাকা-পয়সা নিয়ে ভাবতে হতো না! কিন্তু সব তো আল্লাহই দেন! আবার ছিনিয়েও নেন! বিয়েশাদি হলো ইবাদত! এটা হুজুরের বয়ানেই শুনেছি! আমার কাছে মনে হয়েছে, মাযুর মেয়েটাকে বিয়ে করলেই বেশি ইবাদত হবে। আল্লাহ বেশি খুশি হবেন!

একথা শুনে, মুফতি সাহেব হুজুর নিয়েই পাত্রের পিতার ভূমিকা নিয়ে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। মেয়ের বাবা এককথায় রাজি! পাত্র যদিও একটু 'আলাভোলা' টাইপের! তা হোক! ছেলেটা আল্লাহর পাগল! বিয়ে হয়ে গেল!

খাদেম সাহেব বলেন:

-পরিবারের পায়ে সমস্যা থাকার কারণে ভারী কাজ করতে পারে না। আমাকে বাইরের কাজ সেরে ঘরের কাজেও হাত লাগাতে হয়। কিন্তু আল্লাহ আমাকে সুখী করেছেন!

কুরবানীর ঈদের সেবার চামড়া কালেকশন শেষ হলো। কিন্তু বড় হুজুরের হাতে একটা টাকাও নেই। সাধারণত মাদরাসার ফান্ড থেকে টাকা তুলে চামড়া কেনা হয়। এবারও তাই হলো! সবটাকা চামড়াতে আটকে গেল। এক প্রভাবশালী নেতা সব চামড়া নিজেই কিনবেন বলে নিয়ে গেলেন! টাকাটা সময়মতো দিলেন না! এজন্য বেতন দেয়া যাচ্ছে না। সবার মন ভীষণ খারাপ! বড় হুজুর কিছু না খেয়ে মসজিদে গিয়ে ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছেন! অন্য হুজুররা যে যার মতো করয-হাওলাত করে চলে গেছেন। খাদেম সাহেবের কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। খাদেম সাহেবের মতো আরেকজনেরও প্রায় একই অবস্থা। তিনি খাদেম সাহেবকে বললেন:

-আমার কাছে কিছু টাকা আছে, স্টো দিয়ে আমার বাড়ি যাওয়া পোষাবে না! তবে মনে হচ্ছে আপনার হয়ে যাবে!

-কিন্তু শুধু ভাড়া হলেই তো হবে না! অন্য খরচ-বিরচ আছে না!

-আপনি আপাতত চলে যান! ইনশাআল্লাহ দুদিন পর চামড়ার টাকা পাওয়া গেলে, আপনার জন্যে পাঠিয়ে দেব!

-আচ্ছা! কিন্তু হুজুর! আমার জন্যে আপনি বাড়ি গেলেন না!

-জি না! তা নয়। এটাকা দিয়ে আমার বাড়ি যাওয়া যাবে না! আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি চলে যান!

-এভাবে শুধু ভাড়ার টাকা নিয়ে বাড়ি যেতে শরম লাগছে! ছুটকিয়ারা (বাচ্চারা) সবাই অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে! আব্বু আসবেন! তাদের জন্যে কিছু নিয়ে যাবেন! খালি হাতে কীভাবে যাই! আগে একবার বাড়িতে যোগাযোগ করি! দেখি ওদিকের কী পরিস্থিতি!

খাদেম সাহেব চিন্তিত ভঙ্গিতে দোকানে গেলেন ফোন করতে। তখন এক মিনিট সাত টাকা করে নিত। আর গ্রামে রিসিভ করলেও টাকা দিতে হতো! একটু পর মানুষটা হাসতে হাসতে ফিরে এল!

-কী ব্যাপার! গেলেন কাঁদতে কাঁদতে! ফিরে এলেন হাসতে হাসতে! টাকার ব্যবস্থা হয়েছে?

-জি না!

-তবে? হাসছেন যে বড়?

-হাসছি পরিবারের কথা শুনে!

-কী কথা শুনি?

-আমি বললাম: বেতন হয়নি আসতে পারছি না! সে জানতে চাইল, ভাড়ার টাকা আছে কি না! আমি বললাম আছে! সে বললো:

-আপনিই আমাদের কাছে বড় ঈদ! টাকা-পয়সা লাগবে না! আপনি আসুন! অবশ্যই আসুন!

-ভালোবাসতে কি 'পা' লাগে? ভালোবাসা কি 'পা' দিয়ে হয়? ভালোবাসার জন্যে 'কলব' লাগে! 'দিল' লাগে!

* * *

মাওয়াদ্দাহ

আমাদের হুজুর বিয়ে করেছেন 'উলার' বছর। মানে মিশকাত পড়ার সময়। মাওলানা হওয়ার এক বছর আগে। হুজুর এমনিতে ভাবগম্ভীর! ব্যক্তিত্বসম্পন্ন! এক দুর্বল মুহূর্তে তিনি আমাদের কাছে বিয়ের দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেছিলেন:

-বিয়ের পর মাদরাসায় এলাম। দুষ্ট সাথিরা ছেঁকে ধরল। তাদের কারগুজারী শোনাতে হবে! আচ্ছা, তোরাই বল, দুজনের একান্ত বিষয়গুলো কাউকে বলা যায়! না বলা উচিত! কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা!

এদিকে আমার হয়েছে এক জ্বালা! সামনে মারকাযি (কেন্দ্রীয়) পরীক্ষা! খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে! অথচ কিতাবের পাতায় মন বসাতে পারছি না। *মিশকাত শরীফের* শরাহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ)*মিরকাত*টা ভালোভাবে পড়তে হবে! কারণ, বেশিরভাগ প্রশ্ন এই কিতাবকে সামনে রেখেই হয়! আগের প্রশ্নগুলো যাচাই করে দেখেছি! কী করি! কিতাবের পাতা ওল্টালেই 'তাইনের' ছবি দেখি! সে হাসছে! পুরো কিতাবের পাতা জুড়ে! হাসছে আর যেন বলছে,

-এসব পড়ে কী হবে! একবার দেখা করে যান না! আসল পড়া তো আমার কাছে! আমার কাছে আছে আসল কুতুবখানা! একুতুবখানা মুতালা'আ (অধ্যয়ন) করলে, দিল-দেমাগ সব ঠান্ডা হয়ে যাবে।

কী যে করি! এসব কথা শুনলে, কল্পনা করলে, দিল-দেমাগ গরম গরম হয়ে যায় না? শীতল করার আরজু জাগে না? তাকে একনজর দেখার তামান্না হয় না? পলে পলে তাকে দেখার তিষণা বাড়তেই থাকে!

সারাক্ষণ আমার মনমরা ভাব দেখে সাথিদের টনক নড়ল! কী রে তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন? কোনো সমস্যা!

-না না, আমি ঠিক আছি!

-কিছু একটা তো হয়েছেই! নিশ্চয় বাড়ির কথা মনে পড়েছে! ঠিক কি না বল!

-ইয়ে মানে! একটু-আধটু তো মনে পড়বেই! কিন্তু সমস্যা হলো পড়ায় মন বসাতে পারছি না! কিতাবের পাতা ওল্টালেই শুধু তার চেহারা ভেসে ওঠে! তার কথা মনে পড়ে! রাতে ঘুম হয় না। নামাযে দাঁড়ালে সূরা পড়ার কথা ভুলে কোন ফাঁকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কথা ভাবতে থাকি! একামতের আওয়াজ শুনে সংবিৎ ফিরে আসে!

-তোর অবস্থা তো সিরিয়াস রে! দ্রুত বিহিত করা দরকার! তোকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে!

-ডাক্তার! তার কাছে গিয়ে কী হবে? আমি পুরোপুরি সুস্থ! আর হাতে একটা টাকাও নেই!

-আরে ব্যাটা! হসপিটালের ডাক্তার নয়! আসল ডাক্তার! টাকার ব্যবস্থা? সে দেখা যাবেখন!

সাথিরা আমাকে *মিরকাতের* সামনে বসিয়ে রহস্যময় মুচকি হাসতে হাসতে চলে গেল। আমি আবার *মিরকাতের* পাতায় পাতায় 'তাইনের'(তাঁর) ছবি দেখে সময় গুজরান করতে লাগলাম! অপূর্ব সেই চোখমুখের নেশায় বিভোর হয়ে গেলাম! পরীক্ষার খেয়ার চলছে। ক্লাশ নেই। শুধুই পরীক্ষার প্রস্তুতি! আমার পড়াশোনা সব বন্ধ হয়ে গেল! কিছু একটা করতেই হবে! এভাবে চলতে দেয়া যায় না!

মাগরিবের পরে হাঁপাতে হাঁপাতে দুই সাথি এল। জোর করে আমার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বলল:

-এখুনি শ্বশুর বাড়ি চলে যা! দেখা করে আয়!

-পঞ্চাশ টাকা? এত টাকা কোথায় পেলি?

-আমদের মিশকাত জামাতের সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলেছি!

-মান-ইজ্জত সব শেষ করে দিলি শেষ পর্যন্ত!

-মান-ইজ্জত নিয়ে পরে ভাবা যাবে! এখন তুই রওনা দে তো, নইলে দেরি হয়ে যাবে!

-নৌকা পেয়ে গেলে রাত বারোটার মধ্যে পৌঁছে যাব! অনেক দূর হাঁটতে হয় তো! তোরা কেউ সাথে যেতে পারবি? আমার একা এতদূর যেতে ভয় লাগবে! নাহলে আগামী কাল ফজর পড়ে যাই?

-তোর যা মুমূর্ষ অবস্থা দেখছি! তুই আরেক রাত টিকবি বলে মনে হচ্ছে না! আচ্ছা আমরা দুজন সাথে যাব! তবে ঘরে প্রবেশ করব না! দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে চলে আসব!

-যাহ্! এটা হয় নাকি! আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে তোরা এমন রাত-দুপুরে খালিমুখে চলে আসবি? তারচেয়েও বড় কথা এতরাতে তোরা ফিরবি কী করে?

-কেন পায়ে হেঁটে? *শরহে আকায়েদের* চল্লিশটা মাসয়ালা তাকরার করতে করতে পথ ফুরিয়ে যাবে! তা ছাড়া আগামীকাল মাদরাসার ধান কাটতে হবে! আমাদের জামাতের দায়িত্ব! তোর নাম আমরা কোনোভাবে আড়াল করে রাখব! পরে হুজুরের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করে নেব!

-নাহ, গেলে হুজুরের কাছ থেকে ছুটি নিয়েই যাব! আর তোরা দুজন তো জায়গিরে থাকিস! ছুটি নেয়ার প্রয়োজন নেই! ফজরের পরপর মাদরাসার ধানি জমিতে উপস্থিত হয়ে গেলেই হলো!

কালক্রমে হুজুর শিক্ষক হলেন। জীবনসঙ্গিনীর প্রতি ভালোবাসা-মাওয়াদ্দা-ও যেন পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল। প্রতি বৃহস্পতিবার এলেই হুজুর চঞ্চল হয়ে উঠতেন। আল্লাহর কী ইচ্ছা, হুজুর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। একটা পা দিনদিন নিঃসাড় হয়ে পড়ছে! চলতে ফিরতে ঠিকমতো সাড়া দিচ্ছে না পা'টা! দ্রুত চিকিৎসা দরকার! ডাক্তার বললেন, অপারেশন করতে হবে! ঘটনা এত দ্রুত ঘটল, হুজুর বাড়ি গিয়ে বিদায় নেয়ার সুযোগও পেলেন না। আর বাড়ি যাবেনই-বা কী করে! দীর্ঘ পায়েহাঁটা পথ পাড়ি দেয়া এই অবস্থায় মোটেও সম্ভব নয়। দুজন মিলে ধরাধরি করে হুজুরকে সব কাজ করাতে হয়। দরসেও আমরা কয়েকজন এসে ধরাধরি করে নিয়ে যাই!

বাড়ি থেকে খবর এল! অপারেশন থিয়েটারে যাওয়ার আগে একবার অবশ্যই যেন দেখা হয়! কিন্তু কী করে? শেষে ঠিক হলো! আম্মাজানকে নিয়ে আসা হবে! মাদরাসার পাশের একবাসায়! তাই করা হলো!

আমরা হুজুরকে ধরাধরি করে নিয়ে গেলাম। বাইরে দাঁড়িয়ে আছি! বিদায় নেয়ার পালা চুকে গেলে মাদরাসায় নিয়ে যাব! ভেতর থেকে ফোঁপানির বোবা আওয়াজে আমরা বিহ্বল হয়ে পড়লাম। হুজুর বারবার কান্নাভেজা স্বরে বললেন:

-মুবারাকা, এটা অত্যন্ত সাধারণ অপারেশন! ঝুঁকি নেই বললেই চলে!

দুজনে অনুচ্চার কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে আমাদের খারাপ লাগছিল! অবশ্য হুজুরের আওয়াজই শুধু শোনা যাচ্ছিল! তাও সবটা নয়, ছাড়া ছাড়া! দূরেও যেতে পারছি না! ডাকার সাথে সাথেই হাজির থাকতে হবে! তারপরও হুজুরের মুখে সেই 'মুবারাকা' ডাকটা এত বছর পরও কানে লেগে আছে! এত সুন্দর করে কেউ কাউকে ডাকতে পারে! এত আদর করে? এত মায়া

করে? এতটা ভালোবাসা মাখিয়ে? এতটা করুণ করে? স্বপ্ন ছিল আমিও হুজুরের মতো করে ডাকব! চেষ্টাও করেছি! হুজুরের সেই ডাকে এমন কিছু ছিল, আমি তার সিকিভাগও ডাকের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারিনি? আচ্ছা পেয়ারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আয়েশাকে আদর করে 'হুমায়রা' ডাকতেন? সেটা কেমন শোনাত? রেকর্ড থাকলে মন্দ হতো না! রিং টোন হিশেবে ব্যবহার করা যেত!

সাক্ষাৎপর্ব শেষ হলো। হুজুর দরজায় টোকা দিলেন। আমরা এগিয়ে গেলাম। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন। দরজাটা তখনো সামান্য ফাঁক! আমরা এগিয়ে যেতেই দরজার ওপাশ থেকে ঠাস করে আওয়াজ এল। দরজার কপাট জোরে লেগে আওয়াজটা হয়েছে। আমরা এগুতে পারছিলাম না। হুজুরের জামা দরজায় ভেতরে আটকে গেছে! দরজাটা ফাঁক করে জামার কোণ ধরে টান দিলাম! আসে না! হুজুর বুঝতে পারলেন ভেতর থেকে জামা টেনে ধরে রাখা হয়েছে! কান্নার গমকে হুজুরের পুরো পুরো শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল! কিন্তু নিজেকে শক্ত করলেন। জোর করে জামাটা ছুটিয়ে রওনা দিলেন। পরে খবর পেয়েছিলাম, আম্মাজান হুজুরকে বিদায় দেয়ার পর বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন। জামার খুঁটটা তখন তার হাতে ধরা ছিল! স্বামীর প্রতি ভালোবাসা এতটা গভীর হতে পারে! অবশ্য এভালোবাসার সাথে জীবনের আশঙ্কা জড়িয়ে ছিল! তাই গ্রামের এক সরল বধূর মনটা নানা দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল!

হুজুর যতদিন হাসপাতালে ছিলেন, আমরা উভয়দিকের যাবতীয় দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম। প্রতিসপ্তাহে একজন গিয়ে বাড়ির বাজার করে দিয়ে এসেছি। এদিকে হাসপাতালে হুজুরের খেদমতেও কোনো ঘাটতি পড়তে দিইনি। তবে মজার ব্যাপার হলো। জামাতের প্রায় সবাই সম্মিলিত অলিখিত একটা চুক্তিতে একমত হয়েছিল:

-বিয়ে করতে হলে, 'মুবারাকা' নাম্নী কাউকে খুঁজতে হবে! সমনাম্নী পাওয়া না গেলেও, এমন করে ভালোবাসতে পারে, তেমন কাউকে ঘরনি করতে হবে! তারপর আমরাও তাকে মিহি স্বরে ডাকব:

-মুবারাকা!

এমনিতেই দুষ্টুমি করে নিজেরাই একজন আরেকজনকে মুবারাকা বলে অনেক ক্ষেপিয়েছি! নামটা হালের ভাষায় যাকে বলে, আমাদের জামাতে বেশ 'ভাইরাল' হয়ে গিয়েছিল।

* * *

বুড়ো হয়ে গেছেন। তবুও প্রতিসপ্তাহে বাড়ি যাওয়া চাই-ই চাই! মাদরাসা থেকে বাড়ি বেশি দূরে নয়। আবার কাছেও নয়। প্রায় আট-নয় কিলোমিটার তো হবেই। হুজুর যেতেন পায়ে হেঁটে! ফিরতেনও পায়ে হেঁটে! মাঝেমধ্যে ফিরতেন রিকশায় চড়ে। শাড়ি দিয়ে ঢাকা রিকশা। নামতেন মাদরাসা থেকে বেশ দূরে। তারপর হেঁটে বাকি পথ। ব্যাপারটা বেশিদিন চাপা রইল না। দুষ্ট ছেলের দল তদন্ত শুরু করল। চমকপ্রদ রিপোর্ট এল! হুজুরের নাতির কাছেই ঘনীভূত রহস্যের সমাধান মিলল!

-রিকশা শাড়ি দিয়ে ঢাকা থাকে কেন রে?

-দাদাজি একা আসেন না তো! সাথে দাদিজানও আসেন।

-কেন?

-দাদুর নাকি দাদাজিকে একা ছাড়তে ইচ্ছে করে না!

-তাই বলে এই বুড়ো বয়েসে?

-নিষেধ করার পরও না শুনলে কার কী? আর রিকশাও আমাদের বাড়ির! চালক অবশ্য আমার বড় চাচার ছেলে!

-রিকশা চালায় বুঝি?

-না না, তিনি মাদরাসার শিক্ষক! দাদা-দাদুকে পৌঁছে দেয়ার জন্যেই তিনি একদিনের তরে রিকশাওয়ালা বনেন। দাদাজিকে নামিয়ে আবার দাদুকে নিয়ে ফিরতি পথ ধরেন!

আরও মজার ব্যাপার হলো, মাঝেমধ্যে 'বুড়ি' আম্মাজান তার নাতিকে সহিস বানিয়ে হঠাৎ হঠাৎ মাদরাসায় চলে আসতেন। হুজুরের থাকার কামরাটা ছিল মাদরাসার এক কোণে। রাস্তার পাশেই। শাহী ফটক ঘেঁষে। বাহির থেকে এসে চট করে ঢুকে পড়া যেতা কেউ দেখে ফেলার আগেই। সেটা হতো সাধারণত সোমবার কি মঙ্গলবার রাতে! হুজুর যেদিন বিকেলে বাজারে যেতেন! আমরা বুঝে যেতাম আজ কুইচ 'গড়বড়' হোগা!

মাগরিবের আগে হুজুর হাসতে হাসতে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে জামাত ধরতেন। মসজিদের দরজায় রেখে যেতেন সদাইপত্র! দুষ্ট ছেলের দল নামাজ বাদ দিয়ে সদলবলে হাজির হতো সদ্য করা 'মার্কেটিং'-এর চারপাশে! বুড়িপ্রেমিকার জন্যে শাড়িগহনা কী কী কেনা হয়েছে দেখতে হবে! ঝোলা খোলার পর সবাই হতাশ! কোথায় কসমেটিকস! এ তো: দু-টাকার ছোলা বুট। পাঁচ টাকার বাদাম। দুই খিলি মিষ্টি জর্দা দিয়ে বানানো পান। সাকুল্যে এই!

একবার ব্যাগ খুলে আমরা ভীষণ অবাক! ভেতরে একটা বেড়ালছানা! হুজুর কার কাছ থেকে যেন এনেছেন। খবর নিয়ে জেনেছি, বাড়ির বেড়ালটা মারা গেছে। বুড়িমা বেড়াল বড় বেশি পছন্দ করেন। কোলে করে খাওয়ান। গোসল করিয়ে দেন। তাই নতুন আরেকটা বেড়ালের ব্যবস্থা। আরেকবার ব্যাগ খুলে দেখি হাঁসের ছানা! বুড়িমার আরেক প্রিয় জিনিস!

তখন না বুঝলেও এখন বুঝি, উপহার শুধু দাম দিয়ে কিনলেই হয় না, মন দিয়ে কিনতে হয়। হোক না সেটা সামান্য বেড়ালছানা! হাঁসের ছানা! দু-টাকার বুট!

বিকেলের বাজার করা দেখেই আমরা বুঝে নিতাম: মর্নিং শো'জ দ্য ডে। তক্কে তক্কে থাকতাম! কখন রিকশা আসে। একজনকে পাহারায় বসিয়ে রাখতাম দরজার কাছটিতে। প্রায়ই দেখা যেত আমরা ঘুমিয়ে পড়ার পর সেই অচিনপুরীর রিকশা কূলে এসে ভিড়েছে! রাজবুড়ি বোরাক থেকে সতর্ক পদক্ষেপে নামছেন। অকর্মণ্য পাহারাদার বদলে দেয়া হলো। তাগড়া জোয়ান দেখে একজনকে ঠিক করা হলো। যত রাতই হোক সে জেগে থাকবে। আমরা আজ আম্মাজানকে আপ্যায়ন করব। মোরগ বিকেলেই কেনা শেষ। হুজুরকে বাজারে যেতে দেখেই পিছু পিছু গিয়েছে একজন বাজার করতে। সুন্দর দেখে একজোড়া চীনা হাঁসের বাচ্চা আরও এক সপ্তাহ আগে আনিয়ে রাখা হয়েছে! সেই সুদূর গ্রাম থেকে। আমরা খাদেম (বাবুর্চি) সাহেবকে বলে-কয়ে রাজি করিয়ে রান্নাবান্না আগেই সেরে রেখেছি!

আমরা অপেক্ষা করতে করতে যখন ধৈর্যের শেষসীমায় তখন আম্মাজান এলেন। কামরার দরজা বন্ধ হতেই, আমরা খাবার-দাবারসহ হাজির হলাম। চুপিচুপি। হাঁসের ছানাদুটো ঝামেলা করছিল। তবুও কী আর করা! সবকিছু গুছিয়ে রেখে দৌড়ে পালিয়ে এলাম। আসার আগে দরজায় মৃদু টোকা! একটু পর দরজা খুলল! আমরা দূর থেকে দেখলাম, হারিকেনের আলোতে হুজুর অবাক হয়ে টিফিন ক্যারিয়ারের দিকে তাকিয়ে আছেন। হাঁসের ছানা দেখে দুচোখ যেন ছানাবড়া! এতক্ষণে আমাদের লিখে রাখা চিরকুটের ওপর নজর পড়ল:

-আম্মাজান! আমাদের পক্ষ থেকে সামান্য মেহমানদারি আর ছোট্ট উপহার! আশা করি গ্রহণ করবেন! ভীষণ খুশি হব!

এই বুড়িমার প্রতি আমাদের সবারই কেমন যেন শ্রদ্ধা জন্ম নিয়েছিল। অদেখা এডোলেসেন্স লাভ? অথবা প্লেটোনিক ইন্টেলেকচুয়াল এফেয়ার?

উঁহুঁ কোনোটাই নয়। এসব কিছু আমাদের মহলে কল্পনাই করা যায় না। আমরা ফারেগ হওয়ার কয়েক বছরের মাথায় হুজুর ইন্তেকাল করেছেন। খবর নিয়ে জানতে পেরেছি, বুড়িমা শোকে পাথর হয়ে গেছেন! ভীষণ মুষড়ে পড়েছেন। তার সাথে কখনো কথা হয়নি। দেখা তো দূরের কথা! তবুও স্বামীর প্রতি তার ব্যাকুল ও অভিনব (আগ্রাসী?) ভালোবাসা আমাদের কচিমনে ভীষণ রেখাপাত করেছিল। বেশ কয়েক বছর আগে, আমরা কয়েকজন মিলে গিয়েছিলাম বুড়িমার কাছে। প্রত্যন্ত গ্রামের এক বাড়িতে। সামান্য কিছু হাদিয়া নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটা একজনকে বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছি। দেখা করার বা দেখা হওয়ার প্রশ্নই আসে না। আমরা গিয়েছিলাম বিবেকের তাকিদে! কিশোরবেলার শ্রদ্ধামাখা ভালোলাগার সলতে উসকে দিতে! একজন অসহায় বৃদ্ধার জন্যে মনের কোণে জেগে ওঠা কষ্টকে প্রশমিত করতে!

জীবন জাগার গল্প: ৬৮৮

খাইরু মাতা'-গুণাইবিবি

গতকাল ওলামা বাজার হযরতের জানাযায় গেলাম। অপেক্ষা করছি। কোথাও বসার জায়গা নেই। তাই দাঁড়িয়ে আছি। রাস্তার ওপর। তখন আরেকজন হযুরের কথা মনে পড়ল। তিনি গতবছর মারা গেছেন। এই মুহূর্তে তার নামটা মনে আসছে না। না আসুক। নাম নয় কামটাই জরুরি। সেহযুরের কিছু কথা বলা যাক।

* * *

ওয়াজ শুনতে বসেছি। গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যবাহী শীতকালীন ওয়াজ। নিচে শুকনো খড় বিছানো। মাথায় ওপর শামিয়ানা। বাঁশের খুঁটিতে ছোট্ট বোর্ডে লেখা:'মনোযোগ সহকারে ওয়াজ শ্রবণ করুন','মাহফিলের পবিত্রতা রক্ষা করুন', 'মুকাব্বির', 'হালাল রিযিক ভক্ষণ করুন', 'পর্দা মেনে চলুন' এমনই আরও নানা বক্তব্য। আমার একটা শখ হলো, ওয়াজ শুনতে গিয়ে এসব বক্তব্যগুলো আগে পড়া। হাতের কাজগুলো লক্ষ করা। কোনটার আর্ট কেমন হয়েছে সেটা তুলনা করা। এবার কোন বোর্ডটা নতুন করে লেখা হয়েছে, সেই মান্ধাতা আমলে লেখা হয়েছে কোনটা, সেটা বের করা। এটা না করলে, মনে হয় ওয়াজ শুনতে আসাটা পূর্ণতা পেল না। চালতা-জলপাই-আলুসেদ্ধ-এর কথা বলতে গেলে রাত পোহাবে। সেটা আরেক দিনের জন্যে তোলা থাক!

ওয়াজ শুরু হলো। এর মধ্যে দুইটা অধিবেশন হয়ে গেছে। এখন ইশার পর। গুরুত্বপূর্ণ কোনো হুজুর এখন বসবেন। আমরা অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি। এরই মধ্যে ওপরের শামিয়ানা ভিজে চুইয়ে চুইয়ে টুপটুপ শিশির ঝরতে শুরু করেছে। অবসান ঘটল প্রতীক্ষার। একজন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ এলেন। আগে তাকে কখনো দেখিনি। তার কথা শোনার সৌভাগ্যও হয়নি। তাই আগে থেকে ধারণা করতে পারছিলাম না, তিনি কেমন কথা বলবেন। আমাদের গ্রামের ওয়াজ মাহফিলগুলোতে, এধরনের হুযুরগণসাধারণত আখেরাত, আত্মশুদ্ধি, পীর-মুরিদী ইত্যাদি বিষয় নিয়েই কথা বলেন। এবং মানুষের ওপর বেশ ভালো প্রভাবও পড়ে। ওয়াজ শুরু করলেন। হাদীস পড়লেন:

= দুনিয়ার সেরা সম্পদ হলো উত্তম স্ত্রী।

* * *

হুযুর হাদীসের সামান্য ব্যাখ্যা করেই, ব্যক্তিগত স্মৃতিতে চলে গেলেন। ওয়াজ করলেন অল্পসময়। এরমধ্যে তার কিছু জীবনদর্শনও জানা হয়ে গেল। বাড়ি এসে হুযুরের ওয়াজের কথা বললাম।

-ওমা তাই নাকি! এমন মানুষের সাথে তো একবার দেখা করা জরুরি! তাহলে আমিও শিখতে পারতাম অনেক কিছু! নিয়ে যাবেন?

-সুযোগ থাকলে অবশ্যই নিয়ে যেতাম। তুমি হুযুরনীর কাছ থেকে শিখতে। আমি হুযুরের কাছ থেকে!

* * *

হুযুরের কথায় ফিরে আসা যাক। হুযুর অবশ্য খাঁটি চোস্ত ফেনীর ভাষাতেই ওয়াজ করেন। কথা বলেন। কোনোরকমের মিশেল দেয়া ছাড়াই। তার পুরো কথায়, একটাও ফেনীর আঞ্চলিক ভাষার বাইরের শব্দ উচ্চারণ করতে দেখিনি। একেবারে গ্রামীণ। মাটির মানুষ। যাবতীয় আধুনিকতার ছোঁয়ামুক্ত।

এক.

শীতকাল এলে বিভিন্ন মাদরাসায় ওয়াজে যেতে হয়। দূর-দূরান্তে। অনেক সময় ফিরতে ফিরতে রাত গভীর হয়ে যায়। যিকির করতে করতে চলে আসি। এসেই দেখি হাতমুখ ধোয়ার জন্যে প্রস্তুত! আমি অবাক!

-এতক্ষণ তো চুলা গরম থাকার কথা নয়?

-হিয়ান আন্নে বুইজতেন্ন! মন গরম থাইকলে, হানিও গরম রাখন যায়!

-কেন্নে গরম রাইখ্‌স এক্কান ক-না!

-আপনি বলেছিলেন রাত গভীর হয়ে যাবে। তাই পানিটা গরম করে, ন্যাকড়া প্যাঁচিয়ে, কুঁড়ার বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছি। তারপর কাঁথা দিয়ে

ভালো করে ঢেকে দিয়েছি। আমি নানুর কাছে শিখেছি এটা। নানুকেও দেখেছি নানার জন্যে এভাবে পানি গরম রাখতেন। নানা মাদরাসা থেকে হেঁটে হেঁটে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত!

দুই.

মাদরাসার ধান তুলতে গিয়েছি। প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে চর এলাকায়। সারাদিনের ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছিল। ঘরে এসে বসতে না-বসতেই জগে করে ঠান্ডা ডাবের পানি নিয়ে উনি হাজির। বিস্ময়ভরা প্রশ্ন মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে গেল :

-এত ঠান্ডা ডাব কোথায় পেলে?

-পুকুরের কাদার মধ্যে পুঁতে ইট চাপা দিয়ে রেখেছিলাম।

তিন.

মাদরাসার কাজে যত দূরেই যেতাম! পইপই করে বলে দিতেন, যেন ফিরে আসি। এমনও হয়েছে, ঢাকা গিয়েছি। কাজ শেষ হয়নি। আরেক দিনের কাজ বাকি থেকে গেছে। 'উনার' কথামতো চলে এসেছি। পরদিন ভোরে ভোরে আবার ঢাকা গিয়ে কাজ সেরে এসেছি।

চার.

তার ওয়াজ শোনার শখ। কাছেপিঠে কোথাও ওয়াজ হলে, রিকশায় করে নিয়ে যেতাম। সেই মাদরাসার পাশের কোনো বাড়িতে নিয়ে রাখতাম। ওয়াজ শেষ হলে দুজনে আবার রিকশায় চড়ে ফিরতাম। উনি অন্য কারও ওয়াজ শুনতে পছন্দ করেন না। শুধু আমার ওয়াজই শোনেন। এ জন্যে প্রায় প্রতিটি ওয়াজই আমি তাকে উদ্দেশ্য করেই করতাম। কারণ, এই একজন মানুষের জন্যে আমি অনেক কিছুই করতে পারি। দূরে কোথাও ওয়াজ হলে, তাকে নিয়ে যেতে পারতাম না। তখন শ্রোতাদের অবস্থা বুঝে ওয়াজ করতাম। না না, আমরা নিজের খরচেই ওয়াজে যেতাম, আসতামও নিজের খরচে। আর ওয়াজ করে টাকা নেয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

পাঁচ.

গ্রামের মাদরাসা। বাবুর্চির সংকট লেগেই থাকে। উনি নিজেই তালিবে ইলমদের জন্যে রান্না-বান্না করে দিতেন। তারা বিকেলে খাওয়ার জন্যে আমাদের জমির ধান দিয়ে মুড়ি ভেঙে দিতেন। ছোট ছোট ছাত্রদের ঘরে ডেকে এনে নিজে বেড়ে খাওয়াতেন। নিজের সন্তানদের মতো করে।

ছয়.

আমি মাদরাসা থেকে কোনো বেতন নিই না। এটা তিনি খুবই পছন্দ করতেন। তাই তিনি চেষ্টা করতেন, সংসারে দুটো পয়সা কীভাবে রোজগার করা যায়। তিনি চাটাই বানাতেন। নারিকেল বিক্রি করতেন। লাউ বিক্রি করতেন। আরও কত কিছু যে তিনি করতেন। শুধু আমার জন্যে ও মাদরাসার জন্যে। মাদরাসার কোনো ছোট তালিবে ইলম অসুস্থ হলে তিনি তাকে ঘরে আনিয়ে নিতেন। রাত-দিন নিজের সন্তানের মতো সেবা-শুশ্রূষা করে সারিয়ে তুলতেন। তার কাছে নিজের সন্তান যেমন আদর পেত, মাদরাসার প্রতিটি তালিবে ইলমও তেমন আদর পেত।

সাত.

সবাই বাপের বাড়িতে গেলে, নিজের স্বামী-সন্তানের জন্যে এটা-সেটা নিয়ে আসে। আর উনি স্বামী-সন্তানের পাশাপাশি মাদরাসার তালিবে ইলমদের জন্যেও কিছু না-কিছু নিয়ে আসতেন।

আট.

মাদরাসা ছুটি হলে সাধারণত ছাত্ররা বাড়িতে চলে যায়। কিন্তু আমাদের এখানে ব্যতিক্রম চিত্র দেখা যেত। ছাত্ররা বাড়ি যেতে চাইত না। তারা তাদের আম্মাজির কাছে থেকে যেতে চাইত। অনেক সময় জোর করে পাঠাতে হতো। গেলেও ছাত্ররা পড়ার কথা বলে দুয়েক দিন আগে চলে আসত। আম্মাজির কাছে দুটো দিন থাকবে বলে।

নয়.

আমি অসুস্থ হয়েছি, তিনি রাতটা ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন, এমনটা কখনো হয়নি। তাকে যতই ঘুমুতে বলি, তিনি সেই একই উত্তর দিতেন :

-ঘুম না আসলে শুধু শুধু শুয়ে থেকে কী লাভ!

বসে বসে কখনো আমার মাথা টিপে দিতেন। কখনো হাতের মটকা ফুটিয়ে দিতেন। কখনো পা টিপে দিতেন। এমনটা অবশ্য প্রতিরাতেই করতেন। নিষেধ করলেও শুনতেন না। বলতেন :

-সারাদিন মাদরাসার কাজে কত দৌড়াদৌড়ি করেন। হাত-পা ব্যথা হয়ে যাবার কথা নয়? শরীরে ব্যথা থাকলে ঘুম আসবে? আরাম করে না ঘুমুতে পারলে আগামীকাল মাদরাসায় সবক পড়াবেন কী করে? এরপর আর কথা চলে না।

দশ.

বছরের শেষ দিকে মাদরাসার ভীষণ টানাটানি পড়ে যায়। হুযুরদের বেতন তো দূরের কথা, তালিবে ইলমদের দৈনিক খাবারের চাল কেনার টাকাও থাকে না। তখন উনি কোত্থেকে যেন একথোক টাকা বের করে আমার হাতে দিতেন। বলতেন :

-এগুলো খরচ করুন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ বরকত দেবেন!

-তুমি এত টাকা কোথায় পেলে?

একবছর একরকম উত্তর হতো। কোনো বছর বলতেন : কানের দুলটা বিক্রি করে দিয়েছি। কোনো বার বলতেন : সারা বছর লাউ-পেঁপে-নারিকেল-মোস্তাকপাতা বিক্রি করে জমিয়েছি। বছরের শেষের দিকে কথা ভেবে।

এগারো.

সকালে রান্না করার তরকারি না থাকলে, পুকুরে জাল মারতে হতো। তাহাজ্জুদের ওজু করতে গেলে, উনি 'নুই' দিয়ে আসতেন। আমি আমি জাল মারতাম, কিন্তু আমাকে জাল টেনে তুলতে দিতেন না। ঠান্ডা পানিতে আমার কষ্ট হবে তাই। তিনিই আস্তে আস্তে জাল তুলতেন। বেশ দক্ষতার সাথেই তিনি কাজটা করতে পারতেন। তার কথা ছিল :

-আপনি বাইরের কাজে সারাদিন কষ্ট করেন! ঘরে আপনার তেমন কোনো খায়-খেদমত করতে পারি না! বাইরের কষ্ট কমানোর সাধ্য আমার নেই, কিন্তু ঘরের কষ্ট কমানোর সাধ্য তো আমার আছে! আমার জাল যদি আপনারটার মতো সুন্দর করে গোল হয়ে পড়ত, তা হলে আপনাকে জাল মারার কষ্টটুকুও দিতাম না।

কথা বলতে বলতে হুযুরের গলাটা ধরে এল। পরম কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত স্বরে বললেন :

-আমাদের নবীজি ঠিক কথাই বলে গেছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো নেককার বিবি।

এমন ভর মজলিসেই তিনি বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন :

-আল্লাহর বান্দি আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। আমাকে একা রেখে। আমি বুড়া মানুষ! সারাজীবন তার সাথে থেকে, এখন একা একা কীভাবে থাকি! আপনার সবাই তার জন্যে দু'আ করবেন।

জীবন জাগার গল্প : ৬৮৯

মানসগঠন!

কিছু অভ্যেস ছেলেবেলাতেই গড়ে দিতে হয়। গড়ে নিতে হয়। বড় হলে সহজে নতুন কিছুতে অভ্যস্ত হওয়া কঠিন। সন্তানের মানসকে সুন্দর করে গড়ে দেয়ার জন্যে মাকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হয়। করা উচিত। বরং বলব আবশ্যক। বাবারাও মায়ের সাথে হাত লাগাতে পারেন। তা হলে গঠনপ্রক্রিয়াটা পরিপূর্ণতা পায়। আধুনিক সমাজে পাশ্চাত্যের একটা বিষয় বেশ চালু : খেলাচ্ছলে শিক্ষা। ইসলামের শিক্ষাটা যতটা না শাব্দিক, তারচেয়েও বেশি হলো হার্দিক। বাহ্যিক কাজ তো আমরা করিই। কিন্তু পেছনে একটা দর্শন বা চিন্তা ছেলেবেলাতেই যোগ করে দিতে পারলে কচিমনে শিক্ষাটা আরও পোক্ত হয়ে বসবে।

* * *

মা ছেলেকে স্কুলে যাওয়ার আগে, মাদরাসায় যাওয়ার আগে চুল আঁচড়ে দেয়। তখন শুধু এটুকু বলা :

-বাবা, নবীজি বলেছেন : যার চুল আছে সে যেন তার সম্মান (যত্ন) করে!

ছোট্ট একটা কথা, সাথে হাদীস শেখা হলো। সুন্নাত আদায় হলো। ছেলের সাজুগুজু হলো, ছেলের মানস গঠন হলো।

* * *

বাবার সাথে জুমা পড়তে বের হওয়ার আগে, মা ছেলেকে প্রস্তুত করে দিলেন। বাবা আতর মেখেছেন। সোনামণিকেও একটু সুবাস মাখানো যেতে পারে। কাজটা হাতের হলেও, মুখটা বন্ধ না রেখে বলতে পারি :

-বাবা, নবীজি কী বলেছেন জানো?

-কী বলেছেন আম্মু?

-তিনি বলেছেন, তোমাদের দুনিয়া থেকে আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে (তিনটা বস্তু) : সুগন্ধি, নারী, আর নামায হলো আমার চক্ষু শীতলকারী।

* * *

বাচ্চাটা মাদরাসায় যাওয়ার আগে, স্কুলে যাওয়ার আগে, তাকে এগিয়ে দিতে এসে, একটা হাদীস স্মরণ করিয়ে দিতে পারি :

-আব্বু বলো তো! ইলম শিখতে বের হওয়ার ব্যাপারে নবীজি কী বলেছেন?

-যে ইলম শেখার জন্যে পথ চলবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।

-একদম ঠিক বলেছ। সোনামণি এবার রওনা হয়ে যাও।

* * *

বিকেলে স্কুল-মাদরাসা থেকে ফিরেই দু-ভাইবোনে মিলে খেলায় মগ্ন হয়েছে। চলছে হই-হুল্লোড়। হাসাহাসি। একফাঁকে বলে দেয়া যেতে পারে:
-তোমাদের হাসির কথা কিন্তু নবীজি বলে গেছেন!
-তাই? তিনি কী বলেছেন আম্মু?
-তোমার ভাইয়ের সামনে হাসিমুখে থাকাও সাদাকাস্বরূপ।

* * *

ছেলেকে আদর করলে, নতুন কিছু বানিয়ে খাওয়ালে, সে খুশি হয়ে বলে :
-আম্মু, তুমি খুউব ভালো!
-তাই! নবীজি কী বলেছেন জানো বাবা!
-কী?
-তিনি বলেছেন, উত্তম কথাও সাদাকাস্বরূপ।

* * *

খেতে বসেছে। সবাই। ভাইয়া পরে এসে বসেছে। হাঁড়িতে ভাত বাড়ন্ত। টান পড়বে। নিজের পাত থেকে কিছু ভাত তুলে দিতে হবে :
-আব্বু, তোমার বেশি হলে ভাইয়াকে কিছু ভাত দিয়ে দাও! নবীজি বলেছেন, তোমার পাত থেকে ভাইয়াকে কিছু দেয়া সাদাকাস্বরূপ।
তুমি অনেক সওয়াব পাবে। আল্লাহ খুশি হবেন।

* * *

ঈদ উপলক্ষে সবাই একসাথ হয়েছে। বাড়িভর্তি লোকজন। গিজগিজ করছে। ছোটবড়। একফাঁকে ডেকে নিয়ে বলে দেয়া যায় :
আব্বু, একটু সতর্ক হয়ে থাকবে। তোমার দ্বারা যেন কেউ কষ্ট না পায়। নবীজি বলেছেন :
- যে ছোটদের স্নেহ করে না আর বড়দের শ্রদ্ধা করে না, সে আমাদের কেউ নয়।

* * *

এখানে তো মাত্র কয়েকটা হাদীস বলা হলো। এমন আরও অসংখ্য হাদীস আছে। বিভিন্ন উপলক্ষে আমরা ছোটদের শুনিয়ে দিতে পারি। স্মরণ করিয়ে দিতে পারি। বার বার হাজিরা নিতে পারি। একটু সচেতন থাকলে, আলাদা করে পড়াতে হয়? এমনি এমনিই তো অনেক কুরআন-হাদীস-কবিতা-আদব-কায়দা শেখা হয়ে যায়!

= জগতের সকল দম্পতি সুখী হোক! =